Vol. 34 | No. 2 | 1991

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জহির রায়হানের উপন্যাস

Volume	34
Issue	2
Year	1991
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান
Published online	February 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v34i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v34i2.6
Pages	121-166
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

জহির রায়হানের উপন্যাস

মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান

কোন শিল্পকর্মই দেশকাল বিশ্লিষ্ট নয়। কারণ দেশকালের আলো-বাতাস থেকে প্রয়োজনীয় প্রাণরস আহরণ করেই শিল্পীমানস হয়ে ওঠে লালিত ও বর্ধিত। মানস-গঠনে ঐতিহ্য ও পরিবেশ পালন করে এক কার্যকর ভূমিকা।[১] ঐতিহ্য-অর্জিত শক্তি নিয়ে শুরু হয় শিল্পীর অভিযাত্রা। দেশ-কালের পরিবেশ দ্বারা শিল্পী হতে থাকেন প্রভাবিত ও পরিশীলিত। এমন অবস্থায় জহির রায়হানের সাহিত্যকর্ম আলোচনার পূর্বে তাঁর মানস-গঠনের ঐতিহ্য ও কালপরিসর বিশ্লেষণ অপ্রাসঙ্গিক নয়।

১. রক্তগত ঐতিহ্য

জহির রায়হান নোয়াখালি জেলার তৎকালীন ফেনী মহকুমার মজুপুর গ্রামে ১৯৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন।[২] তাঁর পিতামহ মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ্ গ্রহণ করেন অর্থকরী বিদ্যা ইংরেজী শিক্ষা। আইন শাস্ত্রে বি·এল· ডিগ্রী নিয়ে মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ্ নোয়াখালিতে আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। কিন্তু এ-পেশার সাথে তাঁর ব্যক্তি-প্রকৃতি সঙ্গতি বিধান করতে পারেনি। তাঁর বিশ্বাস জন্মায় যে, আইন পেশা সৎ জীবিকার অনুপন্থী নয়। অতঃপর আইন পেশা ছেড়ে তিনি সৎ জীবিকার সন্ধানে চলে যান কলকাতায়। খিদিরপুরে শুরু করলেন বিত্তের চর্চা ব্যবসা।[৩] আজীবন আপন ব্যক্তিত্বে তিনি করেছেন বিত্ত ও সততার সাধনা। সততার প্রবর্তনায় পুত্র মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্‌কে দান করলেন ধর্মীয় শিক্ষা, ধর্মশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা নিয়ে মাওলানা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্ গ্রহণ করলেন অত্যন্ত সৎ জীবিকা-শিক্ষকতা। মোদারেছ হিসেবে যোগদান করলেন কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায়। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন।[৪] ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর তিনি ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় ফেকাহ্ শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে যোগ দেন।[৫] বিস্ময়ের বিষয় হলেও সত্য যে, তিনি পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যার কাউকে ধর্মীয় শিক্ষা দেননি; দিয়েছিলেন ইংরেজী শিক্ষা। প্রথম পুত্র শহীদুল্লা কায়সার অর্থনীতিতে নিলেন

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী। দ্বিতীয় পুত্র জহির রায়হানকে করতে চেয়েছিলেন ডাক্তার কিন্তু তিনি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের ছাত্র। সাধারণ শিক্ষা সততার পরিপন্থী নয়, এ বোধ মাওলানা সাহেবের ভেতরে অনুপস্থিত ছিল না। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পঠন-পাঠন তার প্রমাণ।

মাতা সৈয়দা সুফিয়া খাতুনের শিক্ষা ছিল তৎকালীন নবম শ্রেণী। রক্ষণশীল কিন্তু প্রভাবশালী তালুকদার পরিবারের মেয়ে হলেও সমকালীন জাতীয়তাবাদী এবং স্বদেশী আন্দোলন তাঁকে স্পর্শ করেছিল।[৬] আপন হাতে সুতো কেটে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে তিনি অংশ নিয়েছিলেন।

পিতামহ ও পিতামাতার বৃত্ত-ভাণ্ডার অন্তরশক্তি, সত্যনিষ্ঠা ও উদার দৃষ্টিশক্তি, রক্ত প্রবাহে ধারণ করেই জহির রায়হানের জন্ম। ভবিষ্যৎ শিল্পী-সত্তার এসব গুণ অঙ্কুরিত হয়েছে তাঁর রক্তগত ঐতিহ্যের স্তর-গভীরে।

২. পারিবারিক পরিমণ্ডল

পিতামহ মোহাম্মদ এমদাদউল্লা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ও আদর্শবান পুরুষ।[৭] পুত্র মাওলানা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্ পিতৃ আদর্শে হন পরিপুষ্ট। ধর্মচর্চার সাথে সাথে পেশা হিসেবে নিলেন শিক্ষকতা। ধর্মীয় শিক্ষক ছিলেন তিনি, ধর্মগুরু ছিলেন না। ধর্মশাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়েও তিনি আধুনিক শিক্ষাকে অবহেলা করেননি। নিজে ও পুত্র-কন্যাদের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। ন্যায়নিষ্ঠ, আদর্শপুষ্ট উদার পরিবারের আধুনিক পরিমন্ডলে জহির রায়হানের জন্ম।

পরিবারের ভাইবোনদের মধ্যে অগ্রজ শহীদুল্লা কায়সার সকলের বড়দা এবং জহির রায়হান নিজে ছিলেন মেঝদা। জহির রায়হানের চৈতন্য গঠনে বড়দা শহীদুল্লা কায়সারের প্রভাব ও প্রবর্তনা ছিল অত্যন্ত গভীর এবং দূরসঞ্চারী।

শহীদুল্লা কায়সার ছিলেন 'দৈনিক সংবাদ'-এর যুগ্ম-সম্পাদক ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক।[৮] কেবল সাংবাদিকতা নয়, রাজনীতি ও সাহিত্যচর্চাতেও তিনি ছিলেন সমান অনুরক্ত। কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় তাঁর রাজনীতির সূচনা। প্রকাশ্যে ছাত্র ফেডারেশন ও গোপনে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল তাঁর রাজনৈতিক কর্মাঙ্গন।[৯] কমিউনিস্ট আন্দোলনের দায়ে তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। *সংসপ্তক*, *সারেং বউ*, *তিমির বলয়*, *পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ*, *রাজবন্দীর রোজনামচা* ইত্যাদি শহীদুল্লা কায়সারের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক অবদান।[১০] শহীদুল্লা

কায়সারের প্রেরণায় জহির রায়হান ছাত্রাবস্থায় আসেন রাজনীতির সংস্পর্শে[১১] এবং অচিরেই হয়ে ওঠেন একজন কর্মচঞ্চল কর্মী। এই অগ্রজের অন্তরঙ্গ প্রবর্তনায় নির্মিত হয় জহির রায়হানের একটি পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক চেতনালোক।[১২]

অগ্রজা নাফিসা কবীর ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রী। বামপন্থী ছাত্র-রাজনীতিতে ছিল তাঁর সক্রিয় পদচারণা। অগ্রজার রাজনৈতিক অনুকূল মতাদর্শ জহির রায়হানকে স্পর্শ করেছিল এবং তাঁর রাজনৈতিক চেতনা লালনে নিয়েছিল বিশেষ ভূমিকা।[১৩]

জহির রায়হানের পারিবারিক পরিমন্ডল পর্যবেক্ষণে আরও কয়েকটি নাম উচ্চারণ অপ্রাসঙ্গিক নয়। তাঁদের সাহচর্য জহির রায়হানের শৈশব-কৈশোরের মানসিক উদ্বোধনে হয়েছিল সহায়ক। তাঁরা হলেন জননী সৈয়দা সুফিয়া খাতুন, গৃহ-পরিচারিকা খায়রুন্নেসা ও তারিকুন্নেসা। তাঁরা অন্তঃপুরে রূপকথা ও কল্পকাহিনী-চর্চার একটি মনোরম পরিবেশ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁদের রূপকথার পরিবেশনায় জহির রায়হানের বালক মনে উন্মোষিত হয়েছিল এক স্বপ্নরাজ্য।[১৪] কালিক অভিঘাতে পুষ্ট হয়ে পরবর্তীকালে এই সপ্নরাজ্য রূপান্তরিত হয়েছিল এক রসগ্রাহী সাহিত্যিক ভুবনে।

জহির রায়হানের পারিবারিক পরিমন্ডলে একদিকে সত্যনিষ্ঠ উদার আদর্শবোধ, অপরদিকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক চিন্তাস্রোত ও সাহিত্যচর্চার এক স্রোতোধারা চলতে দেখা যায়। এই স্রোতোধারায় পরিশীলিত হয়ে জহির রায়হানের চৈতন্যলোক লাভ করে রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক সংবেদনা যা পরবর্তীকালে জীবনের বিভিন্ন মানবিক ক্ষেত্র থেকে ইপ্সিত নির্যাস গ্রহণে হয়েছিল সমর্থচারী।

৩. ব্যক্তিক পঠন-পাঠন

মননচর্চা সৃজনীশক্তির উৎস। এই মননচর্চার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা। ১৯৪০ সালে কলকাতা মডেল স্কুলে জহির রায়হানের শিক্ষাজীবনের সূচনা।[১৫] পিতা মাওলানা হাবিবুল্লাহ্ তখন কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষক। জহির রায়হানের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়াশুনা সম্পন্ন হয় মডেল স্কুলে। তারপর তাঁকে কলকাতা মিত্র ইন্‌স্টিটিউশনে ভর্তি করা হয়।[১৬] এখানে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করে তিনি কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার অ্যাংলো-পার্শিয়ান বিভাগে ভর্তি হন। এখানে অধিককাল পড়াশুনা সম্ভব হয়নি। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের ফলে পিতার সাথে তাঁকে বাধ্য হয়ে কলকাতা ছাড়তে হয়।

দেশের বাড়ী আমিরাবাদ হাই স্কুল থেকে জহির রায়হান ১৯৫০ সালে ম্যাট্রিক এবং ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে ১৯৫৩ সালে আই· এস· সি· পাশ করেন।[১৭] রাজনৈতিক কারণে তাঁর আই· এস· সি·-তে একবছর বিঘ্নিত হয়েছে। সাহিত্য-আগ্রহী জহির রায়হান অভিভাবকের মতামত উপেক্ষা করে, বিজ্ঞান ছেড়ে, বাংলা সাহিত্যে অনার্স নিয়ে ভর্তি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।[১৮] ১৯৫৮ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন এবং এম·এ· শ্রেণীতে ভর্তি হন।[১৯] কিন্তু চূড়ান্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হননি। রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে অনার্স সমাপ্তিতে তাঁর বিলম্ব ঘটেছে। অপরদিকে চলচ্চিত্র পরিচালনার ব্যস্ততায় তিনি এম·এ· ডিগ্রী সম্পন্ন করতে পারেন নি।

ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর ভেতরে জন্ম নেয় চলচ্চিত্রের প্রতি গভীর আগ্রহ। এ কারণে পড়াশুনার অবসরে চলতে থাকে তাঁর চলচ্চিত্র-বিষয়ক বিভিন্ন পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার পঠন-পাঠন।[২০] ১৯৫২ সালে রাজনৈতিক কারণে কারাভোগের পর মুক্তি পেয়ে ছায়াছবি-বিষয়ক পড়াশুনার সংকল্প করলেন এবং কলকাতার প্রমথেশ বড়ুয়া মেমোরিয়াল ফটোগ্রাফিক স্কুলে ভর্তি হলেন।[২১] পরবর্তীকালে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন চলচ্চিত্র-চর্চা। ফলে চিত্র পরিচালনার ব্যস্ততার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালীবদ্ধ-পড়াশুনায় তাঁর ছেদ পড়ে।

অপরদিকে স্বপ্নবিজ্ঞান ও হস্তরেখা বিজ্ঞানে তিনি হয়ে ওঠেন আগ্রহী এবং অভিনিবেশী।[২২] ফলে শাস্ত্র দু'টি হয়ে ওঠে তাঁর চর্চা ও অনুশীলনের অন্যতম ক্ষেত্র।

সাহিত্যের উচ্চতর পঠন-পাঠন জহির রায়হানের সৃজনীচেতনাকে করে তোলে, শাণিত, মার্জিত ও পরিশীলিত। অপরদিকে ফটোগ্রাফিক ও স্বপ্ন-বিজ্ঞানে অতিরিক্ত পঠন-পাঠন, পরিচর্যা ও পরিচর্চা তাঁর সৃজনী চৈতন্যের গভীরে যোজনা করে এক নতুন মাত্রা। এর ফলে তাঁর গল্প-উপন্যাসের গঠনশৈলী হয়ে উঠেছে চিত্র-নাট্যিক কৌশলপুষ্ট আর তাঁর ক্ষুদ্রকায় উপন্যাস 'কয়েকটি মৃত্যু' রচনার গভীরে সঞ্চারিত হয়েছে 'স্বপ্ন বিজ্ঞানের' এক বাস্তব প্রবর্তনা।

৪. ব্যক্তি-সাহচর্য

লেখকের সৃজনীচৈতন্য সমাজভুক্ত অপরাপর ব্যক্তির সান্নিধ্য ও সাহচর্যে অনেকাংশে হয় পরিপুষ্ট, পরিমার্জিত ও রূপান্তরিত।[২৩] জহির রায়হানের

ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়া বহুলাংশে সচল ও সক্রিয়। ভারত বিভাগের পর উত্তপ্ত কলকাতা থেকে ফিরে এলেন আপন জন্মস্থানে। সেখানে তিনি দু'জন বিশিষ্ট বিপ্লবী ব্যক্তির সাহচর্যে আসবার সুযোগ লাভ করেন। তাঁরা হলেন চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ক্ষিতিশ চক্রবর্তী ও বসন্ত ভৌমিক।[২৪] তাঁদের সান্নিধ্য জহির রায়হানের রাজনৈতিক চৈতন্যে সঞ্চার করে এক তরঙ্গচাঞ্চল্য।[২৫]

অগ্রজ শহীদুল্লা কায়সারের প্রবর্তনায় জহির রায়হান ছাত্রাবস্থায় আসেন রাজনীতির সংস্পর্শে। ১৯৫৩/৫৪ সালের দিকে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। এসময় কমিউনিস্ট নেতা মণি সিংহের দেয়া রাজনৈতিক নাম 'রায়হান' গ্রহণ করেন।[২৬] পারিবারিক নাম মোঃ জহির উল্লাহ্র সাথে রাজনৈতিক নামটি যুক্ত হয়ে পরিচিত হলেন জহির রায়হান হিসেবে। কমিউনিস্ট নেতা মণি সিংহের সাহচর্য তাঁর রাজনীতির ক্ষেত্রে নির্মাণ করে একটি ভিন্ন প্রবর্তনা।

অগ্রজা নাফিসা কবীরের স্বামী ডা. আহমদ কবীর ছিলেন বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শচারী। তিনিও জহির রায়হানের রাজনৈতিক চৈতন্য লালনে পালন করেন এক বিশিষ্ট ভূমিকা।[২৭] শুধু তাই নয়, 'যাত্রিক' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে জহির রায়হান ডা. আহমদ কবীর ও ডা. আলিম চৌধুরীর সান্নিধ্যে আসেন।[২৮] সুতরাং জহির রায়হানের সাহিত্যিক চৈতন্য লালনেও তাঁদের ভূমিকা অনুজ্জ্বল নয়।

১৯৫৬ সালে বিশিষ্ট কবি আহসান হাবীবের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'প্রবাহ' পত্রিকায় জহির রায়হান ছিলেন সহকারী সম্পাদক। এছাড়া কবি আহসান হাবীবের সাথে ছিল তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গতা। এই ঘনিষ্ঠ সাহচর্য জহির রায়হানের সৃজনী চৈতন্যকে করেছিল পরিশীলিত ও পরিমার্জিত।

কলকাতায় চলচ্চিত্র বিষয়ে পড়াশুনার সূত্রে তিনি ফটোগ্রাফিক স্কুলের বিশিষ্ট শিক্ষক প্রমথেশ বড়ুয়ার নিকট–সান্নিধ্যে আসেন। এরপর ১৯৫৬ সালে প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক এ.জে. কারদারের সাথে কাজ করার সুযোগ লাভ করেন।[২৯] এই দুই বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বের সাহচর্যের ফল হয়েছিল অত্যন্ত দূরসঞ্চারী।

রাজনীতি, সাহিত্য ও চলচ্চিত্র জহির রায়হানের সৃজনীচৈতন্যে হয়ে উঠেছিল পরস্পর সম্পূরক ও পরিপূরক। একটি থেকে অপরটি ছিল প্রায় অবিচ্ছেদ্য।

৫. দেশ—কালের পরিবেশ

একটি রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সংকটের ভেতর দিয়ে জহির রায়হানের কৈশোর কাল হয়েছে অতিবাহিত। অপরদিকে নীচের ক্লাসের ছাত্রাবস্থায় ছাত্রনেতা অগ্রজ শহীদুল্লা কায়সারের নিবিড় সাহচর্যে তিনি হন রাজনীতির সংস্পর্শবর্তী।[৩০] ফলে জীবনের প্রারম্ভকালেই তাঁর মধ্যে জন্ম নিয়েছে একটি রাজনৈতিক সংবেদনা। এই সংবেদনা তাকে বিভিন্ন আন্দোলনের সাথে করেছে সম্পৃক্ত।

১৯৪৫ সালে 'ভিয়েতনাম দিবস'—এর মিছিলে যোগ দিয়ে জহির রায়হান পুলিশী সংঘর্ষে হয়েছেন আহত।[৩১] তখন তাঁর বয়স দশ বছর। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের মিছিলেও তাঁর কন্ঠ হয়েছে শ্লোগানমুখর।[৩২]

প্রথম বিশ্বসমরের ক্ষতস্থল নিশ্চিহ্ন হবার আগেই শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বসমরের ভয়াবহ সংঘর্ষ। জহির রায়হান তখন মিত্র ইন্‌সৃটিটিউশনের ছাত্র। যুদ্ধজাত শঙ্কা ও সংকট এবং ১৯৪৬—এর ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের রূঢ়তা[৩৩] জহির রায়হানকে স্পর্শ করে গভীরভাবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—গঠিত ঢাকা—কেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ একটি কল্পিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে হয়ে ওঠেন সজাগ ও সক্রিয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁদের সেই স্বপ্নকল্পনা হলো বাস্তবায়িত। কিন্তু অনতিকাল পরেই তাঁদের স্বপ্ন হলো বিচূর্ণ, আকাংক্ষা হলো ভূলুণ্ঠিত। তাঁরা সহজেই অনুধাবনে সক্ষম হলেন যে, পূর্ববাঙলার রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং উৎপাদন ব্যবস্থা পাকিস্তানী বেনিয়া পূঁজির করতলে বন্দী।[৩৪] শিল্পপূঁজির জন্য কাঁচামালের যোগানদার এবং পণ্যসামগ্রীর প্রতিযোগিতাহীন বাজার হিসেবে পূর্ববাঙলা রূপান্তরিত হলো আধা—ঔপনিবেশিক অঞ্চলে।[৩৫]

রাষ্ট্র পরিচালনায় বাঙালীরা অবাঞ্ছিত, অনাদৃত এবং অবহেলিত। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি—সকল ক্ষেত্রে তারা হতেন অস্বীকৃত। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানী জাতির জনক মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা এর অন্যতম দৃষ্টান্ত। বাঙালী মধ্যবিত্ত ও তরুণশ্রেণী হয়ে উঠলেন প্রতিবাদী। ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্তকাল ১৯৫২ সাল। ভাষা আন্দোলনে রক্তদানের মাধ্যমে শোষণক্ষত, অনাদৃত, পদদলিত বাঙালীরা ঐক্যবোধে হলো সংগঠিত।

রক্তস্নাত ভাষা আন্দোলনে জহির রায়হান যোগ দেন একজন সক্রিয় ও সাহসী কর্মী হিসেবে। তিনি তখন জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। ১৯৫২ সালের

২১শে ফেব্রুয়ারীতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার মিছিলে তিনি প্রথম দশজনের একজন।[৩৬] এজন্য তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। ১৯৫৫ সালে একুশ উদ্‌যাপনের জন্য তাঁকে পুনরায় কারাবরণ করতে হয়। এ কারণে রক্তপ্ত একুশের আলোড়ন জহির রায়হানের সৃজনীচৈতন্যে অত্যন্ত গভীর এবং ব্যাপক।

ভাষা আন্দোলনে রক্তদানে মাতৃভাষা মুক্তি পেলো বটে কিন্তু মুক্তি পেলো না বাঙালীর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অধিকার। পাকিস্তানী শোষণে-শাসনে বাঙালীর জীবনবিকাশ হলো অবরুদ্ধ। ফলে বুর্জোয়া মানবতাবাদী ও মার্কসপন্থী বাঙালী মধ্যবিত্ত-শ্রেণী বোধ করলো কঠিন সংকট। বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাদের সামনে উন্মুক্ত হলো সংকটমোচনের তিনটি পথসংকেত: পাক-শাসকচক্রের সাথে আপস কিংবা বিপ্লব অথবা সমাজ-জীবন-ইতিহাসের পথচ্যুত হয়ে আত্মবিবরে আত্মগোপন।[৩৭] জহির রায়হান এই দ্বিতীয়োক্ত আদর্শবোধের প্রেরণায় গল্প-উপন্যাস চর্চায় হয়েছিলেন অভিনিবেশী।[৩৮]

প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের চক্রান্তে ১৯৫৪ সালে আদমজী মিলে সংঘটিত হয় বর্বরোচিত শ্রমিক দাঙ্গা।[৩৯] অল্পসময়ে তার বিষবাষ্প দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। জহির রায়হান তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এর চার বছর পর ১৯৫৮ সালে পূর্ব বাঙলায় জারী হলো সামরিক শাসন।[৪০] অল্পকালের মধ্যে আয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রের শৃঙ্খলে এদেশের নড়বড়ে সামন্ত সমাজব্যবস্থাকে করলেন পুনর্বিন্যস্ত।[৪১] এ সময় ধর্মবোধ ও সাম্প্রদায়িক বিভ্রান্তিকে ব্যবহার করা হলো পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষায়। ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তারই অন্যতম প্রতিক্রিয়া।

১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের[৪২] মাধ্যমে পূর্ববাঙলার প্রগতিশীল সমাজ পুনরায় হয়ে উঠলো একতাবদ্ধ। ১৯৭০ সালে ঘূর্ণিঝড়-বিধ্বস্ত পূর্ববাঙলা পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর কাছ থেকে পেলো উপেক্ষা আর বঞ্চনা। এ বঞ্চনা তাদের ঐক্যবোধকে করলো আরও সুদৃঢ়। যার ফলে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ঘটেছে পরাজয় এবং পূর্ববাঙলার প্রগতিশীল শক্তির হয়েছে বিজয়। ১৯৭১ সালে এই প্রগতিশীল শক্তি অংশ নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে। মুক্তিযুদ্ধের বিজয় জন্ম দিয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

গত কয়েক দশকের ঐতিহাসিক ঘটনাবর্ত জহির রায়হানের সৃজনীমানসকে করেছে আলোড়িত ও শক্তিপুষ্ট। তাঁর বেশীর ভাগ শিল্প-

মাধ্যমে এরই ছায়ালোক হয়েছে রূপান্বিত। এই বিশিষ্টতা তাঁকে রাজনীতি-সচেতন শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে তিনি কর্মী হিসেবে কমিউনিস্ট, শিল্পী হিসেবে নন। তাঁর শিল্প-কর্ম নিবেদিত ছিল গণতন্ত্র আর শোষণমুক্তির পক্ষে।[৪৩] জহির -রায়হান চৈতন্যে সমাজতন্ত্রী, শিল্পবোধে গণতন্ত্রী জীবনবোধে রোমান্টিক আর দৃষ্টিবোধে আবেগপুষ্ট ও চিত্রাত্মক।[৪৪]

উপন্যাস

শেষ বিকেলের মেয়ে

'শেষ বিকেলের মেয়ে' জহির রায়হানের প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসটি প্রথমে সাপ্তাহিক চিত্রালীতে ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত[৪৫] এবং পরে ১৯৬০ সালে সন্ধানী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত। পরবর্তীকালে ১৯৮১ সালে ড. আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত জহির রায়হান রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়।

উপন্যাসটি সর্বজ্ঞ কথনে রচিত হলেও তা নায়ক কাসেদের দৃষ্টিকোণাশ্রয়ী। সমগ্র কাহিনী কাসেদের দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত। এ ক্ষেত্রে লেখক এতটা অবিচল ছিলেন, যার ফলে কাসেদ ছাড়া অন্যান্য চরিত্রের অন্তর-গহ্বর থেকে গেছে অনালোকিত। এ কারণে কয়েকটি চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ হয়েছে বিঘ্নিত।

উপন্যাসটি রচনাকালে জহির রায়হানের বয়স ছিল কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে। বয়োধর্মের কারণে আবেগময়তা অপ্রত্যাশিত নয়। তাই শেষ বিকেলের মেয়ে অনেকখানি আবেগ-আক্রান্ত এবং অতি মাত্রায় রোমান্টিক।[৪৬] কাসেদের আবেগ-আক্রান্ত স্বপ্নভঙ্গের বেদনাময় শব্দরূপ নির্মাণই ছিল লেখকের অন্বিষ্ট। নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনে সাধ এবং সাধ্য, প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির মধ্যে সবসময় বহমান রয়েছে একটি দুস্তর ব্যবধান। তাই আশাভঙ্গের বেদনা তাঁদের নিত্যসাথী। এই বেদনাদগ্ধ জীবনচিত্র নির্মাণে লেখক অনেকাংশে সার্থক। কিন্তু উপন্যাসের শিরোনামে সে ইঙ্গিত অনুপস্থিত।

উপন্যাসের প্রথম অংশে কাসেদের জাহানারাকেন্দ্রিক স্বপ্নকল্পনা হয়ে উঠেছে বিরক্তিকর। এরপর কাসেদের অতীত স্মৃতিচারণায় সালমা-প্রসঙ্গ পাঠককে বিরক্তি মুক্ত করেছে। উপন্যাসের ঘটনাবর্তে স্বাভাবিক ভাবেই শিউলির সাথে পরিচিত হয়েছে কাসেদ। পরবর্তীকালে জাহানারার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান-তাড়িত কাসেদ শিউলির কাছে হয়েছে আশ্রয়প্রার্থী। ঘটনা ধারায় এর অনিবার্যতা অস্বাভাবিক নয়। শিউলির প্রত্যাখ্যানজাত বেদনাময় পরিণতির মাধ্যমে উপন্যাসটির পরিসমাপ্তি হতে পারতো। তবুও একদা বিকেলে বিয়ের

আসর থেকে নাহারের উঠে আসা এবং কাসেদের নিকট অন্তর-উন্মোচন হয়েছে অত্যন্ত আকস্মিক ও অস্বাভাবিক। এখানে মনে হয় লেখক কেবলমাত্র শিরোনাম নির্দেশিত পরিণাম নির্মাণ করেছেন। এতে শিরোনামটি ইঙ্গিতময় হলেও বিষয়বস্তু ব্যঞ্জিত হয়নি।

নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি কাসেদ আহমদ। সে পেশায় কেরানী, নেশায় কবি। সে কেরানীর মতো কর্মশীল, কবির মতো ভাবুক। তার জীবনে সাধ আছে সাধ্য নেই। তাই সে জাহানারাকে নিয়ে আপনমনে নির্মাণ করে স্বপ্নলোক:

> একদিন জাহানারাকে বিয়ে করবে কাসেদ। ছোট একটি বাড়ী থাকবে তার, শহরে নয়, শহরতলীতে। যেখানে লাল কাঁকরের রাস্তা আছে আর আছে নীল সবুজের সমারোহ। মাঝে-মাঝে দু'পায়ে কাঁকর মাড়িয়ে বেড়াতে বেরুবে ওরা। সকালে কিংবা সন্ধ্যায়। রাস্তায় লোকজনের ভীড় থাকবে না। নিরাল পথে মন খুলে গল্প করবে ওরা। কথা বলবে — কখনো কানে কানে, কখনো মনে মনে, কখনো নীরবে।''[৪৭]

সামান্যতেই কাসেদ বার বার স্বপ্নচারী হয়ে ওঠে। সে যতটা স্বপ্নচারী, ততটা সক্রিয় নয়। স্বপ্নবিহার অপরাধ নয়। কিন্তু মাত্রাধিক্যতা ও নিষ্ক্রিয়তা অপৌরুষোচিত।

জাহানারাকে সে ভালবাসে। কিন্তু প্রবল দ্বিধামুক্তির অভাবে তা অপ্রকাশিত। সুযোগ সন্ধানী কাসেদ একবার সুযোগ পেয়েও জাহানারার কাছে আপন অন্তর-উন্মোচনে সক্ষম হয়নি। ফলে তা থেকে গেছে অনুক্ত। সেতার শিক্ষকের চেহারা কল্পনা এবং তার প্রতি জাহানারার আচরণে কাসেদের উৎকণ্ঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক বর্ণে চিত্রিত।

সালমার অন্তর-আবেদনে একদা কাসেদ সাড়া দেয়নি। অথচ পরবর্তীকালে অন্যত্র বিবাহিতা সালমার জন্য জাগে তার অন্তর-আক্ষেপ। অফিসের হেড-ক্লার্ক মকবুল সাহেবের অসুন্দরী দারিদ্র্যশীর্ণ মেয়েকে নিয়ে সে ঘর বাঁধার কথা ভাবে। এসব তার ভালোবাসা নয়। নৈরাশ্যতপ্ত মস্তিষ্কের ক্ষণিক কল্পনা। শিউলিকে সে এক সময় বিয়ের প্রস্তাব দেয়:

> '' চলুন আমরা দুজনে বিয়ে করি। এক নিঃশ্বাসে কথাটা বলে ফেললো কাসেদ। যে কথাটা জাহানারাকে বলার জন্য দীর্ঘদিন ধরে মনের সঙ্গে লড়াই করেছিল, সে কথাটা শিউলিকে মুহূর্তে বলে দিলো সে।''[৪৮]

এটা কাসেদের অনুরাগ নয়, প্রত্যাখ্যানজাত যন্ত্রণাতাড়িত উচ্চারণ মাত্র। আসলে সকল ভালোবাসা তার জাহানারার জন্য, অন্য কারও জন্য নয়।

উপন্যাসটির পরিণতি অংশে হলুদমাখা নাহার চলে আসে বিয়ের আসর থেকে এবং প্রকাশ করে কাসেদের সাথে তাঁর বিয়ের কথা। তখন:

> "কাসেদ বোবার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো ওর (নাহার) হলুদ মাখানো মুখের দিকে। কিছুতেই সে ভেবে পেলোনা, সেই চাপা মেয়েটা আজ হঠাৎ এমন মুখরা হয়ে উঠলো কেমন করে? পেছনের দরজা বন্ধ করতে করতে সে শুধু মৃদু গলায় বললো, চলো, ও ঘরে চলো।"[৪৯]

এখানে মনে হয় কাসেদ যেন এই আকস্মিক ঘটনার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। "বোবার মতো ফ্যালফ্যাল করে" তাকানো এ-প্রেক্ষিতে যথেষ্ট নয়। প্লটবয়ন ও চরিত্র নির্মাণে এ-অংশটি হয়ে উঠেছে আকস্মিক এবং অবিশ্বাস্য।

কাসেদ একজন আন্তরিক, সত্যনিষ্ঠ, হৃদয়বান পুরুষ। কিন্তু সে বন্ধু হিসেবে যতটা সার্থক, প্রেমিক হিসেবে ততটা নয়। কাসেদ যদি হয় নায়ক, জাহানারা তবে নায়িকা। কিন্তু জাহানারা চরিত্রটি শেষাবধি রয়ে গেছে অনেকাংশে অস্পষ্ট অবিকশিত রহস্যময়। জাহানারা একটি বিকাশমান চরিত্র হতে পারতো কিন্তু লেখক সে সুযোগ গ্রহণ করেননি। জাহানারার মনোগত পরিচয়টি পাঠকের কাছে স্পষ্ট নয়। ফলে চরিত্রটি পাঠকের ভাবনাকে করেছে সংকটাপন্ন।

সেতার মাস্টার ও কাসেদ, উভয়ের প্রতি জাহানারার আচরণ রহস্যময় হলেও তার মধ্যে সৌজন্য, ভদ্রতা ও বন্ধুত্ব অনুপস্থিত নয়। তার আচরণ এর চেয়ে বেশী কিছু আবিষ্কার করা কঠিন। সেতার মাস্টার ও জাহানারা সম্পর্কে শিউলির মন্তব্যের কোন বাস্তব ভিত্তি উপন্যাসে প্রত্যক্ষ নয়।

সালমা চরিত্রে দু'টি প্রান্ত উন্মোচিত। কৈশোর ও যৌবন, বিবাহ-পূর্ব ও বিবাহ-উত্তর। এমনি পর্যায়বদ্ধ আর কোন চরিত্র এ-উপন্যাসে চিত্রিত হয়নি। তবুও চরিত্রটি গতানুগতিক, বৈচিত্র্যমুখী নয়।

কৈশোর থেকেই কাসেদের প্রতি সালমার একটি হৃদয়গত দুর্বলতা ছিল। কাসেদের কাছ থেকে কোন অনুকূল সাড়া না পেয়েও সে তার দুর্বলতাকে লালন করেছে। বিবাহ-উত্তরকালেও তার অবসান হয়নি। কারণ তার দাম্পত্য জীবন সুখের নয়। এই অ-সুখের কারণ অত্যন্ত গতানুগতিক।[৫০]

কিশোরী সালমার চাঞ্চল্য ও অন্তর–বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক বর্ণে হয়েছে রঞ্জিত। যৌবনবতী বিবাহিত সালমার অভিমানী বিক্ষোভও হয়ে উঠেছে স্বাভাবিক। বিক্ষুদ্ধ সালমা একসময় কাসেদকে প্রস্তাব দেয়: "আজ এখান থেকে বেরিয়ে তুমি আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে দূরে, বহুদূরে?"[৫১] এটা কাসেদের পৌরুষকে জাগিয়ে তোলবার একটি কৌশলমাত্র।[৫২]

জাহানারার মতো আরেকটি রহস্যময় চরিত্র শিউলি। তবে শিউলি চরিত্রে রহস্যের চেয়ে অসঙ্গতি অধিক। ছেলেদের কাছে তার প্রত্যাশা প্রেম নয়, বন্ধুত্ব। তার এ– প্রত্যাশা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। তবুও অনেক ছেলে তার বন্ধুত্বকে ভুল করে, নিবেদন করে প্রেম। এ–প্রেম তাকে আহত করে। এ–আহতবোধও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কাসেদের সাথে তার আচরণ বন্ধুত্বের সীমানায় সীমিত থাকেনি। ঘটনাক্রমে শিউলি কাসেদকে বলেছে:

> "আমার দিকে অমন করে চেয়ে থাকবেন না কিন্তু। সুন্দর চোখের চাউনি আমি বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারি না। .... অদ্ভুত মায়াময় চোখ দু'টো আপনার, দেখলে ভালবাসতে ইচ্ছে করে।"[৫৩]

অন্যত্র বলেছে:

> "মাঝে আপনাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করে কেন বলুন তো?"[৫৪]

অথবা অন্য একদিনের জিজ্ঞাসাঃ

> "ধরুন আমি যদি আপনাকে ভালবাসি। আপনি কি তা সহজ করে নিতে পারেন?"[৫৫]

—এটা কোন পুরুষের কাছে প্রেম নিরপেক্ষ বন্ধুত্বের প্রবর্তনা হতে পারে না। অথচ যন্ত্রণাতাড়িত নিরাশ্রয় কাসেদের বিয়ের প্রস্তাবে শিউলির বিস্ময়াচ্ছন্ন উচ্চারণ:

> "আপনাকে অন্য পাঁচজনের চেয়ে ভিন্ন মনে করতাম বলেই হয়তো এত সহজভাবে মিশতাম। কিন্তু .... আপনিও শেষে ওদের মতো হয়ে যাবেন এ আমি ভাবিনি কোনদিন।"[৫৬]

—এ–অসঙ্গতি শিউলি চরিত্রের সম্ভাবনাকে করেছে বিপর্যস্ত।

কাসেদ ভিন্ন সকল চরিত্র মনোবিশ্লেষণ বর্জিত। নাহার তাদের অন্যতম। অথচ তার মনোবিশ্লেষণ ছিল অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ অন্যদের তুলনায় স্বল্পবাক, প্রায় নীরব।

উপন্যাসের পরিণামী–অংশে নাহার বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে এসে কাসেদকে: ''নির্বিকার গলায় বললো, বিয়ে আমার হয়ে গেছে। ···· যার সাথে হয়েছে তার কাছেই তো এসেছি আমি। তাড়িয়ে দেন তো চলে যাই।''৫৭ এতে মনে হয় কাসেদ–নাহারের সম্পর্ক অনেকদিনের অথচ সকলের অগোচরে নাহার আপন অন্তরলোকে যে বাসনা সঞ্চয় করেছিল তার কোন ইঙ্গিত লেখক কখনও দেননি। এমনি সাহসী উচ্চারণ স্বল্পবাক এই নারীর পক্ষে যেমন আকস্মিক তেমনি বিস্ময়কর। শিউলির মতো নাহার চরিত্রের সম্ভাবনাও হয়েছে বিনষ্ট।

জহির রায়হানের প্রথম রচনা হিসেবে কিছুটা দুর্বলতা সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত জীবনের খন্ডিত চিত্রনির্মাণে উপন্যাসটি অনেকাংশে হয়ে উঠেছে বাস্তব।

তৃষ্ণা

'তৃষ্ণা' উপন্যাসটি ১৯৬২ সালে রচিত এবং সাপ্তাহিক 'চিত্রালী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ১৩৮২ বঙ্গাব্দে এবং ১৯৮১ সালে রচনাবলীতে অন্তর্ভুক্ত।

পূর্ববর্তী শেষ বিকেলের মেয়ে উপন্যাসটি নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী। 'তৃষ্ণা' উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়। ব্যতিক্রম মধ্যবিত্ত জীবনের স্তরবিন্যাসে। তৃষ্ণার জীবনবৃত্ত শেষ বিকেলের মেয়ে অপেক্ষা নিম্নতর স্তরে অবস্থিত। অনালোকিত পুরাতন একটি বাড়ীতে বিচিত্র পেশাজীবী অনেকগুলি পরিবারের বাস। কোন্দলপ্রিয় মানুষের কোলাহলময় পরিবেশ নির্মাণে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে স্বাভাবিক এবং বাস্তবস্পর্শী।

শওকত ও মার্থার চিরন্তন জীবনতৃষ্ণা ও আর্থিক অভিঘাতে তাদের স্বপ্নভঙ্গের আলেখ্য নির্মাণ এ–উপন্যাসের লক্ষ্য। নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের স্বপ্ন, সমস্যা ও আকাংক্ষা তৃষ্ণা উপন্যাসের কেন্দ্রবস্তু হিসেবে বিবেচিত।

সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাসটি পরিবেশিত। কিন্তু লেখক ঘটনাস্রোতটি প্রত্যক্ষ করেছেন নায়ক শওকতের দৃষ্টি–সমগ্রতায়। এক্ষেত্রে লেখকের নিরাসক্তি ও নির্লিপ্ততা বিঘ্নিত হয়নি। কিন্তু আহমদ হোসেনের উপস্থিতি ও তার উক্তি–সমষ্টিতে এই নির্লিপ্ত নিরাসক্তি সর্বত্র বজায় থাকেনি।

উপন্যাস উপস্থাপনায় শওকতের দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হলেও সেখানে লেখকের জীবনার্থ সুস্পষ্ট নয়। পক্ষান্তরে আহমদ হোসেনের সংলাপে

জীবনদর্শন তুলে ধরলেও অনেকক্ষেত্রে তা হয়ে পড়েছে অসংলগ্ন। কারণ তার ভেতরে কারারুদ্ধ পুত্রশোকাহত পিতার মানসিক বিকৃতির আভাস মেলে। সমাজ-বীক্ষণে কখনও কখনও গৃহীত হয়েছে আহমদ হোসেনের দৃষ্টিকোণ। তার সংলাপে কিছু সত্য উচ্চারিত হলেও চরিত্র হয়ে উঠেছে অসঙ্গতি-আক্রান্ত।

উপন্যাসটির প্লট পরিবেশনায় অবলম্বিত হয়েছে বিশেষ কৌশল। সূচনাতে উন্মোচিত হয়েছে পরিণতি-অংশ। পরিণতি দু'টি অংশে বিভক্ত আর এই বিভক্তিগত শূন্যতা পূরণ করেছে মূল কাহিনী। ফলে তৃষ্ণা উপন্যাস হয়ে উঠেছে ফ্লাশব্যাক পদ্ধতি-আশ্রয়ী।

'তৃষ্ণা'-তে নায়কের শারীরিক বর্ণনায় জহির রায়হান অনেকটা সময় ব্যয় করেছেন যেটা তাঁর অপর কোন উপন্যাসে লক্ষিত হয়নি। এ-বর্ণনা কর্মকঠোর শওকতের বিশুষ্ক অবয়ব নির্মাণে হয়েছে সহায়ক। শওকত অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে আসা নিম্নমধ্যবিত্ত যুবক। তার জীবনে নিদারুণ সমস্যা ও সংকট রূপায়ণে লেখকের কৃতিত্ব সবিশেষ উল্লেখ্য।

ঔষধ চুরির অপরাধে মার্থার গ্রেপ্তারী-সংবাদে শওকত হয়েছে বিস্মিত ও বেদনাবিদ্ধ। বেদনাতাড়িত শওকত হয়ে ওঠে অস্থির, যন্ত্রণাচঞ্চল। পথে পথে অশান্ত বিচরণ এবং প্রাকৃতিক বর্ণনায় শওকতের যন্ত্রণাদগ্ধ অস্থিরতা হয়েছে ব্যঞ্জনাময়। এ ছাড়া শওকতের দৃষ্টিকোণ থেকে বিপন্ন মার্থার বিষাদিত ক্রন্দন বৃষ্টির ব্যঞ্জনায় হয়ে উঠেছে সজীব এবং প্রাণময়:

> 'বৃষ্টির আলিঙ্গনে সারা দেহ ভিজে চুপসে গেছে ওদের। এ বৃষ্টি যেন মার্থার চোখের জল। অন্ধকার হাজতে বসে হয়ত তখন নীরবে কাঁদছে।' ৫৮

মার্থার বিপর্যয়ে এবং জীবনবঞ্চনায় সঞ্চিত ক্রোধ আর বিক্ষোভের তাড়নায় শওকত হয়ে ওঠে উত্তপ্ত-মস্তিষ্ক। মাতাল কেরানীর প্রহৃত স্ত্রীর ক্রন্দন তাকে মুহূর্তের জন্য করে তোলে নির্মম এবং হিংস্র। মুহূর্তের হিংস্রতায় সে ধারাল দা দিয়ে মাতাল কেরানীকে হত্যা করে। অতঃপর হত্যাকান্ডের প্রত্যক্ষদর্শী নর্তকী সেলিনার হাত ধরে শওকত অন্ধকার পথে ছুটতে থাকলো। অথচ সেলিনা কোন আপত্তি করলো না। শওকতের প্রতি সেলিনার পূর্ব-আগ্রহ ছিল একথা সত্যি। তবুও হত্যাকারী শওকতের রক্তসিক্ত হাতে সেলিনার এই নীরব আত্মসমর্পণ পাঠকের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়না।

তৃষ্ণার পরিণতি-পর্বের শেষাংশে লেখক নির্মাণ করেছেন একটি রোমান্টিক খড়গাদা। খড়গাদার পাদদেশে শওকতের বুকে মুখ রেখে ঘুমিয়ে আছেসেলিনাঃ

> "খড়ের কোণে জেগে উঠলো অনেকগুলো পায়ের ঐকতান। আঠার জোড়া আইনের পা ধীরে ধীরে চারপাশ থেকে বৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়ালো ওদের। ওরা তখনও ঘুমোচ্ছে।"[৫৯]

—আঠার জোড়া আইনের পদধ্বনি উপন্যাসের সমাপ্তিকে করেছে সংকেতময়।

শওকত কৃষ্ণবর্ণের কৃশাঙ্গ যুবক। জীবনের কঠিন সংকটে সে হয়ে উঠেছে কর্মকঠোর, কর্কশ, তৃষিত এক পুরুষ। আশ্রয়দাত্রী মার্থার প্রতিও সামান্য কারণে শওকত প্রদর্শন করে অসংযত, রুক্ষ আচরণ।

মার্থার স্নিগ্ধ আচরণ শওকতকে আকর্ষণ করে, তার অন্তরে জাগ্রত করে জীবনের স্নিগ্ধ শৃঙ্খল-তৃষ্ণা। রাত্রির নির্জনতায় মার্থাকে জড়িয়ে নেয় নিবিড় আলিঙ্গনে, মুখমন্ডলে বর্ষণ করে অজস্র চুম্বন। এটা শওকতের দৈহিক তৃষ্ণা নয়, হৃদয়িক তৃষ্ণা।

বেকারত্বের যাতনাবিদ্ধ শওকত নৈতিকতা থেকে কখনও বিচলিত হয়নি। বৃদ্ধ আহমদ হোসেনের অশোভন ও অশালীন কর্মপ্রস্তাবকে সে প্রত্যাখান করেছে। জীবনযুদ্ধে পরাজিত হলেও সে নৈতিকনিষ্ঠায় হয়েছে বিজয়ী।

মার্থাকে শওকত দিয়েছে চাকুরীর মিথ্যা সংবাদ। সে ভাবে মার্থার উপার্জনের পাশে তারও অবদান রাখা অত্যন্ত সমিচীন। ফলে মার্থার সামনে কর্মহীন শওকতের পৌরুষ হয়ে পড়ে বিপন্ন। এই বিপন্নতা বোধ তাকে করে তোলে মিথ্যাচারী। মিথ্যাচারী হয়ে শওকত রক্ষা করতে চেয়েছে তার আত্মসম্মান।

মার্থার গ্রেপ্তারী-সংবাদ শওকতের ভবিষ্যৎ স্বপ্নকে করেছে বিচূর্ণ। স্বপ্নচূর্ণ শওকত হয়ে ওঠে বেদনাবিদ্ধ, অস্থির, অশান্ত। পথে পথে অশান্ত বিচরণে রূপায়িত হয়েছে তার মানসিক উদ্‌ভ্রান্তি। আকাশে চিলের চিৎকার, বাতাসের ঘূর্ণি, শুকনো পাতার পতন-ধ্বনি—ইত্যাদি প্রাকৃতিক বর্ণনা পরিচর্যায় এই মানসিক উদ্‌ভ্রান্তি হয়েছে শিল্পময়।

স্ত্রী-পীড়নকারী মাতাল কেরানীকে শওকত শাণিত দা-এর আঘাতে করেছে হত্যা। কোন হত্যাকান্ডই সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু আসলে সে এতটা নির্মম প্রকৃতির নয়। মার্থার বিপর্যয়ে, নিরাশ্রয়ী, স্বপ্নবঞ্চিত উত্তপ্ত মস্তিষ্কের সাময়িক উচ্ছ্বাস তাকে এই হিংস্র পথে চালিত করেছে। এমনি করে তার বিক্ষুব্ধ-তপ্ত অন্তরক্রোধ প্রশমনের পথ খুঁজেছে।

সেলিনার প্ররোচনা ও প্রলোভনে শওকত কখনও সাড়া দেয়নি। অথচ সে-ই নাচের মেয়ে সেলিনার হাত ধরে ছুটতে থাকে অন্ধকার নিরুদ্দেশের পথে। এটা ভালোবাসা নয়, ঘটনাবর্তে ক্রোধবিদ্ধ, নিরাশ্রয়ী, বিপন্ন শওকতের একটি তৃষিত তাড়নামাত্র। শওকত সেলিনার হাত ধরে ছুটছে অথচ ভাবছে মার্থাকে:

> "দু'হাতে ওকে (সেলিনা) আবার তুলে নিলো শওকত। তারপর এই ঝড়, এই বৃষ্টি, এই অন্ধকার আর এই শহরকে দু'হাতে ঠেলতে ঠেলতে আবার ছুটতে লাগলো ওরা। বৃষ্টির আলিঙ্গনে সারাদেহ ভিজে চুপসে গেছে ওদের। এ বৃষ্টি যেন মার্থার চোখের জল। অন্ধকার হাজতে বসে হয়ত তখন নীরবে কাঁদছে।"৬০

অতএব মার্থার জন্য তার ভালোবাসা আছে, সক্রিয়তা নেই। অথচ নিষ্ক্রিয় শওকত উপন্যাসের পরিণতি-অংশে নির্মাণ করেছে সেলিনাকেন্দ্রিক একটি সংক্ষিপ্ত রোমান্টিক ভুবন।

মার্থা গ্রাহাম কৃষ্ণাঙ্গী যৌবনবতী, সুন্দরী নয়, কিন্তু লাবণ্যময়ী-তার জীবনে আছে একাধিক ঘর-বাঁধা আর ঘর-ভাঙার ইতিহাস। পিটার গোমজ ও খালেদের সাথে তার জীবনবন্ধন এখন অতীতের কথা। নিঃসঙ্গ, নিরাশ্রয়ী মার্থা অতীতচারী নয়, ভবিষ্যগামী, বাস্তব জীবনচারী।

নিরাশ্রয়ী মার্থা হয়ে ওঠে শওকতের আশ্রয়দাত্রী এবং শওকতের নিকট আশ্রয়প্রার্থী। অতীতের সকল গ্লানি ভুলে ছিন্ন-বন্ধন মার্থা এখন জীবনে নতুন বন্ধন প্রত্যাশী। নারীত্বের চিরন্তন প্রত্যাশা ও তৃষিত আকাংক্ষায় মার্থা একটি সজীব ও সক্রিয় চরিত্র।

শওকতকে নিয়ে মার্থা স্বপ্ন দেখে, নির্মাণ করে ভবিষ্যতের জন্য নতুন পরিকল্পনা:

> "দোকানটা পেলে আর কোন ঝামেলাই থাকবে না আমাদের। আমি কাউন্টারে বসে দোকান চালাবো। তুমি বাইরে থেকে জিনিষপত্র কিন এনে দেবে। হিসেবটা দেখবে। কি চমৎকার হবে তাই না।" ৬১

অর্থসংগ্রহে তৎপর হয়ে ওঠে মার্থা। দোকান থেকে ঔষধ চুরি করে ধরা পড়ে। পুলিশ তাকে নিয়ে যায় হাজতে। মার্থা আসলে চোর নয়। জীবনতৃষ্ণার তীব্র তাড়নায় সে চালিত হয়েছে এই আত্মঘাতী পথে। কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে মার্থা অব্যর্থ নয়।

তৃষিত মার্থা কামনা করেছিলো নতুন বন্ধন, জীবনের মধুর শৃঙ্খল। জীবনের শৃঙ্খল তাকে দিলো পুলিশের শৃঙ্খল, জীবনের বন্ধন তাকে দিলো আইনের বন্ধন। মার্থার এই বেদনাময় পরিণাম আরোপিত নয়, চরিত্র-সম্পৃক্ত। জীবনের নৈতিক শৈথিল্যদীর্ণ সংগ্রাম নির্মাণ করেছে এই বেদনাদীর্ণ পরিণাম। তবুও মার্থা সাহসী, সক্রিয়, সজীব ও জীবনবাদী চরিত্র।

আহমদ হোসেন ধর্ম, বর্ণ, জাতি নিরপেক্ষ মানবিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী। আপন মূল্যবোধ সম্পর্কে সে কঠোরভাবে সোচ্চার ও উচ্চকণ্ঠ:

> "আমার কোন জাত নেই। আমি না হিন্দু, না মুসলমান, না ইহুদি, না খৃষ্টান। আমার জাত তুলে কেউ ডেকেছো কি ঘুষিতে নাক ভেঙ্গে দেবো বলে দিলাম।"৬২

সমাজবীক্ষণে ও সমাজের স্বরূপ উন্মোচনে আহমদ হোসেনের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্ববহ। শহরের অন্ধকার গলিতে তার অবাধ বিচরণ। তাই তার অভিজ্ঞতা ব্যাপক। ধর্ম, প্রতারণা এবং মানুষের খোলস ও তার স্বরূপ সম্পর্কে তার উচ্চারণ অত্যন্ত সাহসী:

> "বদনামের ভয় তাই না ···· আজ পনের বছর ধরে দেখে আসছি। আসে আর যায়। বামুন-কায়েথ বলো, আর মোল্লা-মৌলবী বলো, সব বেটাকে চিনে রেখেছি। দিনের বেলা কোট প্যান্ট পরে সাহেব সেজে অফিসে যায় আর যেইনা সন্ধ্যে হলো, অমনি বাবু মুখে রুমাল গুঁজে চট করে ঢুকে পড়ে গলিতে।"৬৩

আহমদ হোসেন কথনে সত্যনিষ্ঠ, কিন্তু জীবনে নীতিনিষ্ঠ নয়। মেয়ের দালালী তার পেশা। এই পেশা গ্রহণে সে দ্বিধাহীন। অর্থ উপার্জন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি সুস্থ নয়। এ কারণে চরিত্রটি হয়ে পড়েছে অসঙ্গতি-আক্রান্ত।

কারারুদ্ধ পুত্রের দুঃখে আহমদ হোসেন কাতর শুধু নয়, এ কারণে সে অনেকাংশে বিকৃত-মস্তিষ্ক। চরিত্রটির মাধ্যমে জীবনার্থ প্রকাশের একটি

প্রয়াস লক্ষণীয়। কিন্তু বিকৃত-মস্তিষ্ক ও নীতিভ্রান্ত আহমদ হোসেন জীবনার্থের বাহক হতে পারেনি।

সেলিনা একজন স্বর্ণাঙ্গী নর্তকী। এ কারণে আচরণে সে দ্বিধাসংকোচহীন, সহজ এবং স্বাভাবিক। শওকতের প্রতি তার একটি গোপন উৎসাহ ছিল। সম্পর্ক স্থাপনে শওকতকে সে বিভিন্ন কৌশলে প্ররোচিত ও প্রলুব্ধ করেছে। তবুও শেষপর্যন্ত ভয়াবহ রক্তসিক্ত শওকতের হাতে তার নীরব আত্মসমর্পণ বিশ্বাস্য নয়।

হাজার বছর ধরে

উপন্যাসটি ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয় এবং একই বছরে লাভ করে আদমজী সাহিত্য-পুরস্কার।[৬৪] শেষ বিকেলের মেয়ে ও তৃষ্ণা উপন্যাসের নগরজীবনের আবর্ত ছেড়ে লেখক এবার অবতরণ করলেন গ্রামীণ জীবনে। গ্রামজীবনকে জহির রায়হান প্রত্যক্ষ করেছেন রোমান্টিক দৃষ্টিতে।[৬৫]

জহির রায়হান এ-উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ। সে দৃষ্টিকাণ শেষ বিকেলের মেয়ে-এর মতো কোন বিশেষ চরিত্রে আবদ্ধ থাকেনি বরং হয়েছে সর্বত্রগামী। ফলে কোন চরিত্রে অস্পষ্টতা প্রশ্রয় পায়নি।

হাজার বছর ধরে উপন্যাসে প্লটবয়নের সরলরৈখিকতা অনেকাংশে হয়েছে পরিত্যক্ত। তবুও তা উপযুক্ত দ্বন্দ্ব জটিলতায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। কারণ সম্ভাবনা লেখক সঠিক ভাবে ব্যবহার করেননি। বাঙালীর ঐতিহ্য-সম্পৃক্ত জীবনধারা নির্মাণই ছিল লেখকের অভিপ্রায়। কুসংস্কার, বিচিত্র রীতি-নীতি ও আচার পদ্ধতি উপন্যাসের বিভিন্ন উপঘটনায় বিধৃত। কিন্তু টুনি ও মন্তুর রোমান্টিক হৃদয়াচরণ হয়ে উঠেছে উপন্যাসটির মৌল আকর্ষণ। সুতরাং সকল উপঘটনা মূলকাহিনীর সাথে সর্বক্ষেত্রে কার্যকারণ-স্পৃক্ত হতে পারেনি।[৬৬]

উপন্যাসের মূলঘটনার ব্যাপ্তিকাল একবছরের কিছু কম সময়ের মধ্যে সীমিত। শাপলা-তোলা শরৎ থেকে পরবর্তী বর্ষাকাল-এরই মধ্যে নির্মিত হয়েছে উপন্যাসটির যাবতীয় ঘটনাবর্ত। এর অব্যবহিত পরবর্তী, শেষ পরিচ্ছেদ মূল কাহিনীর সাথে কয়েক বছরের ব্যবধান নির্দেশ করে। এ-পরিচ্ছেদটি উপন্যাসের মূল কাহিনীর জন্য অপরিহার্য নয়। 'হাজার বছরের পুরনো এইরাত'- এটাই উপন্যাসের সমাপ্তিসূচক বাক্য। লেখক এখানে কেবলমাত্র উপন্যাসের শিরোনাম নির্দেশিত পথে চালিত হয়েছেন এবং এই শিরোনাম বিধৃত তাৎপর্য প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই পরিচ্ছেদটির আয়োজন।

উপন্যাসের কাহিনী একটি নিজস্ব সাবলীল গতিচ্ছন্দ নির্মাণে হয়েছে সক্ষম। তবে সে গতিচ্ছন্দ সর্বত্র অক্ষুন্ন থাকেনি। মকবুল স্ত্রীদের তালাক দেয়ার পর থেকেই কাহিনী অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায় হয়েছে পরিণতিগামী।

কাহিনীর বিস্তৃত অংশ জুড়ে মকবুলের পদচারণা। তবুও সে কেন্দ্রীয় চরিত্র কিংবা নায়ক নয়।[৬৭] তাকে নায়ক নির্মাণের কোন অভিপ্রায় লেখকের ছিল না। আটঘর একান্নবর্তী-প্রায় পরিবারে সে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, কাহিনী অংশে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

মকবুললের স্ত্রী সংখ্যা তিন। একই তিন স্ত্রীর সে স্বামী হতে পারেনি, হয়েছে মালিক।[৬৮] স্ত্রীদের সাথে তার সম্পর্ক মালিক-শ্রমিকের। তাদের শ্রমকে সে উপার্জন-কর্মে ব্যবহার করে। মকবুল তাদর নিয়োগ করে ধান মাড়াই-ছাটাই কর্মে। তার একাধিক বিয়ে যৌবনের তাড়নায় নয়, কর্মের তাড়নায়। দুরন্ত যৌবনা আম্বিয়াকে বিয়ের সংকল্প, ঐ একই কারণে। আম্বিয়ার যৌবন-শ্রী তাকে প্রলুব্ধ করেনি, প্রলুব্ধ করেছে তার সম্পদ ও শ্রমশীলতা। আম্বিয়ার সম্পদ হলো একখন্ড জমি, একটি বসত বাড়ী ও একখানি নৌকা আর শ্রমশীলতা হলো তার বিরামহীন ধান ভানার ক্ষমতা।

চতুর্থ স্ত্রী হিসেবে আম্বিয়াকে গ্রহণের সংকল্পে মকবুলের অপর দুই স্ত্রী আমেনা ও ফাতেমা অনুমোদন দেয়নি। বরং বিরোধিতা করেছে, বসিয়েছে শালিশ বৈঠক। এই অবাধ্যতায় উত্তপ্ত মকবুল তাদের চরম দন্ডবিধান করে তালাক দিয়েছে। তালাক প্রদান এখানে আকস্মিক হলেও অবিশ্বাস্য নয়। স্ত্রীদের সাথে যার সম্পর্ক মালিক-শ্রমিকের তার পক্ষে স্ত্রী ছাটাই অস্বাভাবিক নয়। তবুও মকবুলের এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত উত্তপ্ত মস্তিষ্কজাত। অথচ তারপর শান্ত মস্তিষ্কে তার ভেতরে কোন অনুতাপ আমরা প্রত্যক্ষ করি না।[৬৯] অবশ্য আহত মকবুল অন্তিম মুহূর্তে প্রলাপের মধ্যে আমেনা-ফাতেমার নাম উচ্চারণ করেছে। এটা অনুতাপ নয়, মৃত্যু পথ-যাত্রী মকবুলের অন্তিম প্রলাপ।

মকবুল স্বামী হিসেবে কঠোর, ব্যক্তি হিসেবে কোমল। মেয়ে হিরণের বিয়েতে মকবুলের পিতৃত্ব সজীব, কোমল ও সফল। আবুলের প্রহৃত স্ত্রী হালিমার প্রতি সে হয়ে ওঠে সংবেদনশীল। এছাড়া মন্তুর বিয়ের ভাবনা তাকে করে তোলে দায়িত্বসচেতন।

মন্তু মিয়া উপন্যাসের রোমান্টিক অংশের নায়ক। কিন্তু নায়িকা টুনির তুলনায় সে নিষ্ক্রিয়। এ কারণে কাহিনীর রোমান্সটুকু নিবিড় হয়ে উঠতে

পারেনি।[৭০] আশৈশব মাতৃপিতৃহীন দরিদ্র যুবক মন্তু জীবন–সংগ্রামে যতটা সক্রিয়, প্রেমের ক্ষেত্রে ততটা সক্রিয় নয়। দারিদ্র্য তাকে কর্মক্ষেত্রে যতটা সবল করেছে প্রেমের ক্ষেত্রে করছে ততটা দুর্বল। প্রত্যাশিত নায়কোচিত ব্যক্তিত্ব তার মধ্যে অনুপস্থিত।

মন্তু মিয়ার জীবনে দু'টি ভিন্ন প্রান্তিক নারীর পদপাত লক্ষণীয়। একজন টুনি অপরজন আম্বিয়া। এরা পরস্পর বিপরীত প্রান্ত থেকে মন্তুকে আকর্ষণ করে। টুনির আকর্ষণ হৃদয়গত আর আম্বিয়ার আকর্ষণ দেহগত। উভয় আকর্ষণের মধ্যবর্তী মন্তু মিয়া হয়ে উঠতে পারতো সংকটাপন্ন, দ্বন্দ্বমুখর। অথচ সে সম্ভাবনা ব্যবহৃত হয়নি।

টুনির বারংবার অন্তর–উন্মোচনে মন্তু কখনও সাড়া দেয়নি। অথচ তার সারা অন্তর জুড়ে টুনির পদচারণা। টুনির সাথে নিয়মিত নৈশ অভিসার, সার্কাস রাতের নিবিড় সান্নিধ্য মন্তুর ভাবনাকে ভরে দেয় কানায় কানায়:

> ''বিয়ের কথা ভাবতে গেলে ইদানিং টুনি ছাড়া অন্য কোন মেয়ের কথা ভাবতে পারে না সে। — গ্রামের কতলোক তাদের বউকে তালাক দেয়। মকবুল কেন তালাক দেয় না টুনিকে।''[৭১]

মন্তু আপন মনে সংকল্প করে, পুঁথিকাব্যের পরীবানুর মতো টুনিকে নিয়ে পালিয়ে যাবে শান্তির হাটে যেখানে দুজন পাতবে সুখের সংসার। অথচ সংকল্প বাস্তবায়নে তার কোন উদ্যোগ নেই। অবশ্য পরবর্তীকালে মকবুলের মৃত্যুর পর শান্তির হাটে ঘর বাঁধার প্রস্তাব দিয়েছে। টুনি তাতে জানায় অসম্মতি। অসম্মতি জয় করবার কোন উৎসাহ সে দেখায় না।

হৃদয়মাধুর্য, প্রাণপ্রাচুর্য, সজীবতা ও সক্রিয়তায় টুনি এ–উপন্যাসের নায়িকা। টুনি জহির রায়হানের নির্মিত চরিত্র নয়, হয়ে–ওঠা চরিত্র। টুনি বুড়ো মকবুলের তিন নম্বরের স্ত্রী। কিন্তু সম্পর্ক মালিক–শ্রমিক। এ ছাড়া টুনির তারুণ্য ও প্রাণচাঞ্চল্য থাকে অচরিতার্থ। ফলে যুবক মন্তুর সাথে টুনির হৃদয়িক সম্পর্ক হয়ে ওঠে অনিবার্য। টুনির এই হৃদয়াচরণ ও অন্তর–বেদনা পাঠককে সর্বাধিক মাত্রার আকৃষ্ট করে।[৭২]

মন্তুর প্রতি টুনির হৃদয়বোধে রয়েছে গভীরতার ব্যঞ্জনা। প্রতি রাতে মৎস্য শিকারে মন্তুর সান্নিধ্য–আকাংক্ষা, বুনোলতায় বিক্ষত মন্তুর জন্য উৎকণ্ঠা আর স্নিগ্ধ শাপলা ফুলের নীরব অর্ঘ্য– নির্মাণ করে এক আশ্চর্য হৃদয়ব্যঞ্জনা। হৃদয়ের অধিকারে সে মন্তুকে করতে চায় করতলগত। হিরণের বিবাহ–

উৎসবে আনন্দ-চঞ্চল আম্বিয়াকে মন্তুর ঘরে পালাতে দেখে টুনি হয়ে ওঠে ক্ষিপ্ত ও উত্তপ্ত। অতঃপর বিতর্কপ্রবণ সালেহাকে করে আঘাত। মন্তু-আম্বিয়ার বিয়েতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে কৌশলে। শুধু তাই নয়, সম্পদশালী আম্বিয়াকে বিয়ে করার জন্য আপন স্বামীকে করে প্রলুব্ধ। আম্বিয়াকে সতীন হিসেবে বরণ করতে প্রস্তুত কিন্তু মন্তুকে হারাতে প্রস্তুত নয়।

একদা যে টুনি স্বামীর অমঙ্গলে আনন্দ পেতো, স্বামীর মৃত্যুর মধ্যে আবিষ্কার করতে চাইতো মুক্তির স্বাদ, সেই আহত স্বামীকে সেবা করেছে প্রাণ দিয়ে। অবশেষে স্বামীর মৃত্যুতে উচ্ছ্বসিত হয়েছে অশান্ত কান্নায়। আপন অপরাধবোধের প্রবর্তনায় এই পরিবর্তন। টুনি বৈধব্যকে বরণ করেছে কিন্তু মন্তুকে বরণ করেনি। স্বামীর মৃত্যু তাকে মুক্তি দেয়নি। বরং এক আশ্চর্য সম্ভ্রমবোধ তাকে শৃঙ্খলিত করে। স্বামীর মৃত্যু তাকে বিষণ্ন করে কিন্তু নিঃশেষ করতে পারে না। বিষণ্নতার মধ্যেও জেগে ওঠে তার হৃদয়। ব্যক্ত করে মন্তুর বিয়ে দেখবার প্রবল আকাংক্ষা, নাইয়র আনবার জন্য নিবেদন করে করুণ মিনতি।

বিধবা টুনি চিরতরে চলেছে পিত্রালয়ে। তার এ বিদায় ছিল অত্যন্ত বেদনাময়। এ বেদনা স্বামীর ভিটে ছাড়বার জন্য নয়, মন্তুকে ছাড়বার জন্য। স্বামী-ভিটে বিচ্ছেদের অর্থ হলো মন্তুর বিচ্ছেদ।

পিত্রালয়গামী টুনি মন্তুর নৌকায় হয়েছে আরোহী। পথে যেতে সেই শান্তির হাট। তাদের জীবনের স্মৃতির ঐশ্বর্যে ঘেরা এই শান্তির হাট। বাধাবন্ধনহীন নিরাপদ স্থলে পরম প্রত্যাশিতকে পেয়েও টুনি তাকে গ্রহণ করলো না। মন্তুর ঘর বাঁধার প্রস্তাবকে সে করলো প্রত্যাখ্যান:

> "টুনির চোখের কোণে তখন দু'ফোটা জল চিক চিক করছে। অত্যন্ত ধীর ধীরে মাথা নাড়লো সে। আর অতি চাপা স্বরে ফিস ফিস করে বললো। না তা আর অয়না মিয়া, তা আর অয়না। বলতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো সে।"[৭৩]

নিদারুণ অভিমান টুনিকে প্রত্যাখ্যানের প্রবর্তনা দিয়েছে। আম্বিয়ার সাথে বিয়েতে মন্তুর সম্মতি টুনিকে করে তুলেছে অভিমানী।

মন্তু নায়ক আর টুনি যদি হয় নায়িকা তাহলে আম্বিয়াকে বলতে হয় উপনায়িকা। ব্যক্তিত্ব প্রকাশে টুনি অপেক্ষা আম্বিয়া প্রাগ্রসর। তবে এ-ব্যক্তিত্ব গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে বিদ্রোহী বলে মন হয়। দুরন্ত যৌবন, কঠোর কর্মশক্তি ও অভিভাবকহীনতা আম্বিয়াকে করে তোলে আত্মসচেতন বেপরোয়া।

আম্বিয়ার আচরণে, আপ্যায়নে ও রূপচর্চায় সংকেতিত হয় মন্তুর প্রতি ভালোবাসা:

> "আজও মন্তুর জন্য অপেক্ষা করছিল আম্বিয়া। চুলে তেল দিয়ে সুন্দর করে আঁচড়েছে সে। সিঁথি কেটেছে। পান খেয়ে ঠোঁটজোড়া লাল টুকটুকে করে তুলেছে।"৭৪

তার সম্পদে মন্তু ছাড়া আর কারও অধিকার স্বীকার করে না সে নৌকার প্রতি চাচার দাবী সে প্রত্যাখ্যান করেছে। মন্তুকে নিয়ে চাচার নিষেধ আর সামাজিক লোকনিন্দা সহজেই করেছে অগ্রাহ্য:

> "কউক, তাগো কথায় আমার কিছু আইবো যাইবো না। নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিয়েছে আম্বিয়া।"৭৫

—নির্লিপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আম্বিয়াকে করেছে আরও তাৎপর্যবহ।

আমেনা ফাতেমা হয়ে উঠেছে বাঙলার শাশ্বত নারী। স্বামীর উপার্জনের যন্ত্র হিসেবে তারা ব্যবহৃত কিন্তু তাতে কোন প্রতিবাদ নেই, বিক্ষোভ নেই। এটাই তাদের নারী-ধর্ম। আম্বিয়ার সাথে স্বামীর বিয়ের সিদ্ধান্তে তারা প্রতিবাদ করেনি, তবে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। এই বিঘ্ন সৃষ্টির কারণ সপত্নীভীতি নয়, লোকলজ্জা ভীতি। বিশেষ করে নতুন মেয়ে-জামাইর সামনে লজ্জাটি হয়ে উঠে আরও অসহনীয়।

স্বামী বিয়েতে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী স্ত্রীদের চরম দন্ডবিধান করে তালাক দিয়ে। কিন্তু স্ত্রীদের কাছে মকবুলের ঘর অন্ন সংগ্রহের কর্মস্থল নয়, বহু যত্নে গড়ে তোলা সংসার। এক নিমেষে সংসার চূর্ণ হবার মর্মান্তিক আঘাত ফাতেমাকে মূর্ছিত আর আমেনাকে করে ভূলুণ্ঠিত।

আবুল অত্যন্ত সন্দেহপরায়ণ। অকারণ সন্দেহে বউ প্রহার তার নিত্যকর্ম। নির্মম প্রহারে দু'টি স্ত্রীকে সে হত্যা করেছে। আবুল একটি প্রস্তর-কঠোর, অমানবিক, অবিকশিত চরিত্র। গনমোল্লা, সুরত আলী আপন অবস্থানে সরলতায় চিত্রিত।

ওলা বিবি, ভূতের আছর প্রভৃতি লৌকিক সংস্কার, দারিদ্র্য, উচ্চ বিত্তের শোষণ, বিয়ের আসর ইত্যাদি সজীব গ্রামীণ চিত্র নির্মাণে ও চরিত্র সৃজনে জহির রায়হানের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়।

আরেক ফাল্গুন

'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। গ্রন্থকারে প্রকাশের পূর্বে মাসিক 'সচিত্র সন্ধানী'তে প্রথম প্রকাশিত।

শেষে বিকেলের মেয়ে ও তৃষ্ণা-র নগর আর হাজার বছর ধরে-র গ্রাম ছেড়ে জহির রায়হান এবার অবতীর্ণ হলেন রাজনৈতিক আবর্তে। এদিক দিয়ে 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসটি বিষয়-গৌরবে সমুজ্জ্বল। কারণ ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এর পটভূমি নির্মাণ করেছে।[৭৬] উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে ভাষা আন্দোলনকে প্রথম অন্তর্ভুক্তির কৃতিত্ব জহির রায়হানের প্রাপ্য।

১৯৫২ সালের ফাল্গুনে (২১ ফেব্রুয়ারী) রক্তস্নাত ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হিসেবে জহির রায়হান কারাবরণ করেন।[৭৭] এরপর ১৯৫৫ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী (ফাল্গুন) পালনের উপর আরোপিত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে জহির রায়হান আরেকবার হন কারারুদ্ধ।[৭৮] ১৯৫৫ সালের এই ফাল্গুনকে কেন্দ্র করে আরেক ফাল্গুন উপন্যাস রচিত। সুতরাং বিষয়টি জহির রায়হানের ব্যক্তিত্বসম্পৃক্ত। আপন জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে আহরিত চৈতন্য তাঁকে এ উপন্যাস রচনায় প্রবর্তনা দিয়েছে।

১৯৫২ সালের রক্তসিক্ত স্মৃতিময় ২১শে ফেব্রুয়ারী একটি অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৫৫ সালের এই দিনটি পালনের কাহিনী বর্ণনাই হলো আরেক ফাল্গুন উপন্যাসের মৌল অভিপ্রায়। ঘটনাবর্তের প্রাসঙ্গিক অবসরে উপস্থাপিত হয়েছে বায়ান্নর একুশের স্মৃতিময় ঘটনাংশ। ফলে একুশের চৈতন্য এখানে সমগ্রতা পেয়েছে।

জহির রায়হানের জীবনদৃষ্টি মূলতঃ রোমান্টিক।[৭৯] ফলে 'আরেক ফাল্গুন' রোমান্টিকতামুক্ত নয়। বৃহত্তর রাজনৈতিক ঘটনাবর্তের সাথে যুক্ত প্রণয়াবর্ত; ডলি-মুনিমের প্রেমানুভূতি আর সালমা-আসাদের ব্যক্তিক অন্তরানুভূতি।

পক্ষ-বিপক্ষ চরিত্র অংকনে আর ঘটনার শাখা-প্রশাখা[৮০] নির্মাণে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিগ্রাহ্য। ছাত্র-ছাত্রী, মুনিম, আসাদ, ডলি, সালমা, গোয়েন্দা, মধু ও মতি ভাই'র রেস্তোরাঁ, জাহানারা ও তার স্বামী, বজলে, মাহমুদ, সাহানা, এমনি অসংখ্য চরিত্র ও দৃশ্যাবলীর গ্রন্থন-নৈপুণ্যে নির্মিত হয়েছে এ উপন্যাসের পরিচ্ছন্ন একটি প্লট। প্লটবয়নের নৈপুণ্য শেষ পর্যন্ত অক্ষত থাকেনি। উপন্যাসটির পরিণতি অংশে ডলি ও সাহানার আবির্ভাব

প্লটের প্রয়োগ-কৌশলকে করেছে বিক্ষত ও বিপর্যস্ত। ডলির আবির্ভাবের পশ্চাতে ঔপন্যাসিক যে কার্যকারণ নির্দেশ করেছেন তা মনোবিশ্লেষণ-সম্পৃক্ত হয়নি। অপরদিকে সাহানার আগমন সম্পূর্ণ আকস্মিক এবং কার্যকারণ-সূত্র বিচ্ছিন্ন।

আরেক ফাল্গুন সীমিত সময়ের কাহিনী। এ সময়ের ব্যাপ্তিকাল মাত্র তিনদিন দুই রাত। প্রথম দিনের কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে কাহিনীর সূচনা। প্রথম দিন, রাত এবং দ্বিতীয় দিন ও রাত ধরে চলেছে একুশ পালনের বিরতিহীন প্রস্তুতি। তৃতীয় দিনটি কাহিনীর চূড়ান্তকাল। মিছিল এবং পুলিশী সংঘর্ষের মাধ্যমে অতিক্রান্ত হয়েছে এ চূড়ান্ত কালটি। অতঃপর দিনান্তে কারাতোরণ প্রাঙ্গণে কাহিনীর পরিসমাপ্তি। তাই কাহিনীর ব্যাপ্তিকাল সীমিত কিন্তু ঘটনা উপ-ঘটনা বিস্তৃত। তবুও উপন্যাসটি গতিহীনতায় আক্রান্ত নয়। তৃতীয় দিনের ঘটনা সর্বাধিকমাত্রায় গতিময়।

সিপাহী বিদ্রোহের নির্মম স্মৃতি-বিজড়িত ভিকটোরিয়া পার্কের বর্ণনা দিয়ে উপন্যাসের সূচনা:

> "সকালের কুয়াশায় ঢাকা পড়েছিল পুরো আকাশটা। আকাশের অনেক নীচু দিয়ে মন্থর গতিতে ভেসে চলেছিল একটু করো মেঘ। উত্তর থেকে দক্ষিণে। রঙ তার অনেকটা জমাট কুয়াশার মতো দেখতে। ভিকটোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে ঠিক সেই মেঘের মতো একটি ছেলেকে হেঁটে যেতে দেখা গেলো নবাবপুরের দিকে। দক্ষিণ থেকে উত্তরে।" [৮১]

এই ছেলেটিই উপন্যাসের নায়ক ছাত্রনেতা মুনিম। সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতিময়তা উপন্যাসের সূচনাকে করেছে তাৎপর্যবহ এবং বর্ণনাংশে প্রাকৃতিক পরিচর্যা কাহিনীকে করেছে সংকেতময়। মেঘের গতি 'উত্তর থেকে দক্ষিণে' মুনিমের গতি 'দক্ষিণ থেকে উত্তরে' বর্ণনার এ অংশে সংকেতটি হয়েছে শিল্পময়। উপন্যাসের পরিণতি অংশে লালবাগের বর্ণনা হয়ে উঠেছে ইঙ্গিতময়:

> "লালবাগে যখন প্রথম পুলিশ ভ্যানটা এসে পৌঁছলো বেলা তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে। শুকনো ধুলো উড়ছে বাতাসে। হলদে রোদ চিক চিক করছে লালবাগের মাঠের উপরে, যেখানে এককালে সেই একশো বছর আগে দেশী সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিল বিদেশী বেণিয়াদের বিরুদ্ধে সেই মাঠে।" [৮২]

এই ইঙ্গিত আরও সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছে উপন্যাসের শেষাংশ বর্ণনায়:

> "নাম ডাকতে ডাকতে হাঁফিয়ে উঠেছিলেন ডেপুটি জেলর সাহেব। এক সময় বিরক্তির সাথে বললেন, উহ্ এত ছেলেকে জায়গা দেব কোথায়। জেলখানা তো এমনিতেই ভর্তি হয়ে আছে।
> ওর কথা শুনে কবি রসুল চিৎকার করে উঠলো, জেলখানা আরও বাড়ান সাহেব। এত ছোট জেলখানায় হবে না।
> আর একজন বললো, এতেই ঘাবড়ে গেলেন নাকি?
> আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো।"৮৩

—"আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো"— এ সংলাপে নিহিত রয়েছে ভবিষ্যতে বিরতিহীন আন্দোলনের সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত।

উপন্যাসের রাজনৈতিক ঘটনাবর্ত প্রণয়াবর্ত ও উভয় অংশের নায়ক ছাত্রনেতা মুনিম। সে সারল্যে ও আন্তরিকতায় পরিপুষ্ট এবং নীতিনিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধে অবিচল। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় থেকেছে অবিচল। রাজনৈতিক পেশাজীবী নেতৃবৃন্দের সহায়তার অভাব তাকে বিচলিত করে না। তাদের সম্পর্কে মুনিমের আত্মবিশ্বস্ত উচ্চারণ: ওদের জন্য আমাদের কাজ থেমে থাকবে না।

শহীদ স্মৃতির সম্মানে মুনিম নগ্নপায়ে বিচরণ করে। এটা আন্দোলনের একটি অংশ। এ অবস্থায় মুনিমকে আসতে হয় ডলির জন্মদিনে। ডলির অনুরোধে কিছুক্ষণের জন্য স্যান্ডেল পরে ইমমোরাল হতে চায়নি মুনিম।

আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে মুনিমকে যোগ দিতে হয় বিভিন্ন ছাত্র সভায়। ডলির জন্মদিনে তাই বেশী সময় দিতে পারে না, সান্নিধ্য দিতে পারে না সিনেমাতে। অভিমানী ডলি তাকে প্রেরণ করে প্রত্যাখ্যান-পত্র। প্রত্যাখ্যানতাড়িত মুনিম আহত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মসূচী থেকে বিচ্যুত হয় না। এটা তার রাজনৈতিক আদর্শনিষ্ঠা, ডলির প্রতি অন্তরহীনতা কিংবা কঠোরতা নয়। মুনিম তাকে বিস্মৃত হয়নি। রাজনৈতিক কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে ডলি তার কাছে হয়ে উঠেছে স্মৃতিময়।

মুদ্রণ কার্য, কালো ব্যাজ বিতরণ, কালো পতাকা উত্তোলন, শ্লোগান ও অন্যান্য সাংগঠনিক কর্মানুষঙ্গে মুনিমের সক্রিয়তা বিরামহীন। উপন্যাসের তৃতীয় দিনের চূড়ান্ত ঘটনাংশে সেই তুলনায় তাকে ততটা সক্রিয় মনে হয়নি। এ অংশে মুনিম অপেক্ষা আসাদকে মনে হয়েছে অধিক সক্রিয়। মিছিলে পুলিশী সংঘর্ষে মুনিম হয় আহত। বাম চোখ ফুঠে ওঠে। গ্রেপ্তার হয়ে অপেক্ষা করে

কারাতোরণ প্রাঙ্গণে। নীলার কণ্ঠ–সংগীত আর বেণুর সমবেদনায় মুনিম ডলির স্মৃতিতে হয়ে ওঠে বেদনাবিহ্বল। অতঃপর ডলি আর সাহানার আকস্মিক আবির্ভাবে বেদনাবিহ্বল মুনিম হয়ে ওঠে আনন্দবিহ্বল। ডলি তাকে নিবেদন করে এক গুচ্ছ পুষ্পার্ঘ্য। কারাযাত্রী মুনিম ডলির বিচ্ছেদে বেদনার বদলে বোধ করে আনন্দচাঞ্চল্যঃ

> "মুনিম মৃদু গলায় বললো, হতে দীর্ঘ দিন তোমার সাথে আর দেখা হবে না ডলি।
> ডলি চোখ তুলে তাকালো ওর দিকে।
> স্বল্প অন্ধকারেও মুনিম দেখলো চোখ জোড়া পানিতে ছল ছল করছে। আনন্দে মনটা নেচে উঠলো বার বার। আর সে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছিলো ডলিকে। ডলির এমন রূপ আর কোনদিন চোখে পড়েনি মুনিমের।" ৮৪

মানসিক সংকটমুক্ত মুনিম এখন আনন্দচঞ্চল। অপর কোন সংকট তাকে স্পর্শ করে না। মুনিম চরিত্রে রাজনৈতিক আদর্শনিষ্ঠা ও প্রণয়নিষ্ঠা সমান্তরাল গতিতে বহমান।

আসাদ একজন রাজনৈতিক ছাত্রকর্মী, একনিষ্ঠ বিপ্লবী। পিতার গালিগালাজ ও আর্থিক অসহযোগিতা তাকে আন্দোলন বিমুখ করেনি। রাজনৈতিক ঘটনাস্রোতে সে সারাক্ষণ থাকে কর্মচঞ্চল। বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ, কালো ব্যাজ আর কালো পতাকা বিতরণ ও অন্যান্য কর্মানুষঙ্গে আসাদ ক্লান্তিহীন। চূড়ান্ত ঘটনাংশে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে সে হয়ে ওঠে অসমসাহসী। ছত্রভঙ্গ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে জানায় কণ্ঠবিদারী আহ্বানঃ "ভাইসব রুখে দাঁড়াও"। এ অংশে মুনিম অপেক্ষা আসাদ অধিক সক্রিয় বলে মনে হয় পাঠকের। মাতৃহীন পারিবারিক বন্ধনহীনতা সম্ভবতঃ তাকে এতটা সক্রিয়. এতটা বেপরোয়া করে তোলে।

সালমার কোমল একটি স্পর্শে উন্মোচিত হয়েছে আসাদ চরিত্রের অপর একটি প্রান্ত। আন্দোলনের সময় সালমার বাসায় আশ্রয় নেয় সে। শীতার্ত রাত্রির চারটায় জ্বলন্ত স্টোভের ধারে বসে আসাদ ও সালমা:

> "স্টোভের আরো একটু কাছে সরে এসে আসাদ বললো, সত্যি, ভীষণ শীত পড়ছে। হাতজোড়া বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গেছে, দেখুন।
> বলে হাত দুটো ওর দিকে এগিয়ে দিলো আসাদ। অন্ধকারে মৃদু হাসলো সালমা। হাত বাড়িয়ে ওর হাতের তাপ অনুভব করতে গেলে হাতজোড়া আলতো ধরে রাখলো আসাদ।——

> আসাদ বললো, আমার কাপে চিনি একটু কম করে দেবেন। সালমার মনে হলো, আসাদের গলাটাও যেন কাঁপছে, যেন একটু আড়ষ্ট আর জড়িয়ে যাওয়া কণ্ঠস্বর।"৮৫

এই বিশেষ মুহূর্তে আসাদের চেতনায় জন্ম দেয় অবিস্মরণীয় এক অনুভূতি। সে বার বার হয়ে ওঠে স্মৃতিময় আর সালমার জন্য উৎকণ্ঠা–চঞ্চল। এ আকর্ষণ তার ভালোবাসা নয়, মমতা–বঞ্চিত তৃষিত অন্তরের সাময়িক দুর্বলতা।

ডলি বিত্তবান পরিবারের মেয়ে। ছাত্রনেতা মুনিমের প্রেমিকা। মুনিমের প্রতি সে যতটা অনুরক্ত, তার আদর্শের প্রতি ততটা বিরক্ত ও নিরাসক্ত। জন্মদিনে, শহীদ স্মৃতির সম্মানে নগ্নপদব্রতী মুনিমের উপস্থিতিতে ডলি বিরক্তিবোধ করে। বিরক্তির কারণ মুনিম নয়, মুনিমের নগ্নচরণ। ডলি বলে: এমন করে আমাকে অপমান করতে চাও কেন শুনি।"৮৬ এর পর মুনিমকে বাবার স্যান্ডেল পরতে পরামর্শ দেয়। মুনিম কারও সামনে বিব্রত হোক, হাস্যস্পদ হোক ডলি তা চায় না।

প্রবল কর্মব্যস্ততায় মুনিম তাকে সান্নিধ্য দিতে পারে না, জন্মদিনে বেশী সময় দিতে পারে না, হতে পারে না সিনেমাসঙ্গী। ডলি তাই হয়ে ওঠে অভিমান বিক্ষুব্ধ। বিক্ষোভতপ্ত ডলি মুনিমের উপহারসামগ্রী ফেরত দিয়ে প্রেরণ করে প্রত্যাখ্যান–পত্র। মান–অভিমান অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এত অল্পতেই প্রত্যাখ্যান–পত্র প্রেরণ ডলির চিত্ততারল্যকে উন্মোচন করেছে।

ডলি মুনিমের পরিবর্তে গ্রহণ করে, তার প্রতি অতি উৎসাহী, বজলেকে। বজলের সাথে চলে তার সর্বত্র বিচরণ। এটা বজলের প্রতি ভালোবাসা নয়, অভিমানদগ্ধ ডলির এক বিশেষ অন্তর তাড়না। কিন্তু বজলের আলিঙ্গন গ্রহণ নির্দেশ করে তার চিত্ততারল্যের আরেক প্রান্ত।

উপন্যাসের পরিণামী অংশে ডলি চালিত হয়েছে পরিবর্তনের পথে। মুনিমের গ্রেপ্তারী সংবাদ এবং বজলের কপটতা ও মিথ্যাচারিতা ডলির পরিবর্তনে প্রবর্তনা দিয়েছে। ডলি ফিরে আসে মুনিমের কাছে, কারাতোরণ প্রাঙ্গণে। ডলির এ পরিবর্তন অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু এ পরিবর্তনে কার্যকারণ আছে, মনোবিশ্লেষণ নেই। কারাযাত্রী মুনিমকে ডলি নিবেদন করে একগুচ্ছ পুষ্পার্ঘ্য:

"ডলি এগিয়ে এসে এক মুঠো ফুল গুঁজে দিলো ওর (মুনিম) হাতের মধ্যে। কিছু বললো না। মাটিতে চোখ নাবিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো।–

ডলি চোখ তুলে তাকালো ওর দিকে। স্বল্প অন্ধাকারেও — ডলির চোখজোড়া পানিতে ছল ছল করছে।"[৮৭]

'এক মুঠো ফুল'–এর পরিচর্যায় লেখক নির্মাণ করেছেন একটি পরিচ্ছন্ন ব্যঞ্জনা। ফুল আর হৃদয়, হৃদয় আর ফুলের স্পর্শে ব্যঞ্জনাটি হয়ে উঠেছে অনুভববেদ্য। অপরদিকে চিত্ততারল্য থেকে হৃদয় গভীরতায় ডলির উত্তরণ ঘটেছে।

সামলা মেডিকেলের ছাত্রী, কারারুদ্ধ বিপ্লবী রওশনের স্ত্রী। সে আন্দোলনে প্রস্তরকঠোর, হৃদয়ধর্মে কুসুমকোমল। রওশন দাদার বন্ধু। ভালোবেসে তাকে বিয়ে করেছিল। '৪৮–এর ভাষা আন্দোলনে স্বামী হয়েছে কারারুদ্ধ। কারারুদ্ধ হয়েছে তার ছোট বোন ও ভাই। রাজশাহী জেলে গুলীবর্ষণে স্বামী চিরতরে হারিয়েছে হাত দুটি। বেদনাদগ্ধ সালমা তাই হয়ে উঠেছে নির্ভীক-কঠোর আন্দোলনকর্মী।

স্বামী রওশনের খন্ডিত হাত কখনও শ্লোগানে সজীব হয়ে উঠবে না, নিবিড় আলিঙ্গনে সালমাকে করবে না বেষ্টন। স্বামীর কারামুক্তির সম্ভাবনাও নিশ্চিত নয়। অভিভাবক হিসেবে চাচার উচ্চারণে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রস্তাব। অসহায় রওশনের চিঠিতেও আসে অনুকূল পরামর্শ। এই কঠোর সংকটেও সালমা আপন সিদ্ধান্তে থাকে অবিচল এবং হয়ে ওঠে স্বামীর আদর্শচারী। স্বামী আর স্বামীর আদর্শ তার কাছে অবিচ্ছেদ্য। ফলে তার ভালোবাসায় এসেছে পূর্ণতা ও গম্ভীরতা।

আসাদকেন্দ্রিক ঘটনাবর্তে উন্মোচিত হয়েছে সালমা চরিত্রের অপর এক প্রান্ত। আসাদের চেহারায় তার স্বামীর কিছু সাদৃশ্য আছে। সালমাকে তা আকর্ষণ করে: "কথা বলতে গেলে হঠাৎ রওশনের মতো মনে হয়, বিশেষ করে ঠোঁট আর চিবুকের অংশটুকু। সালমা এক দৃষ্টে তাকিয়েছিল।"[৮৮] শীতার্ত রাতে জ্বলন্ত স্টোভের ধারে বসে:

"... অন্ধকারে মৃদু হাসলো সালমা। হাত বাড়িয়ে ওর হাতের তাপ অনুভব করতে গেলে হাতজোড়া মুঠোর মধ্যে আলতো করে ধরে রাখলো আসাদ। সালমা শিউরে উঠলো।

প্রথমে রীতিমতো ঘাবড়ে গেলো সে। ঈষৎ বিস্মিত হলো। তারপর চুপচাপ মাথা নীচু করে তাকিয়ে রইলো জ্বলন্ত স্টোভটার দিকে। বুকটা দুরু দুরু কাঁপছে তার। এই শীতের ভেতরেও মনে হলো সে যেন ঘামতে শুরু করেছে। কয়েক মুহূর্ত বেশ ভালো লাগছে সালমার। সে ওর মুখের দিকে তাকাবার সাহস পেলো না। হাত জোড়া টেনে নেবার কোন চেষ্টা করলো না। শুধু আধফোটা স্বরে বললো, পানি গরম হয়ে গেছে—বলতে গিয়ে গলাটা অদ্ভুতভাবে কেঁপে উঠলো। তারপর এক সময় আস্তে হাতজোড়া টেনে নিলো সালমা।''৮৯

পরদিন কারাতোরণ প্রাঙ্গণে আসাদের সামনে সালমা হয়ে ওঠে ব্রীড়াকুণ্ঠিত। ভালোলাগা মুহূর্তটি হয়ে ওঠে চিত্রস্পর্শী। তবে এর মধ্যে কোন অনুরাগ নেই, রয়েছে সালমার বিরহতপ্ত সংবেদনশীল চিত্তের সাময়িক বিভ্রম।

বজলে হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সে সাহিত্যকর্মী। রাজনৈতিক কর্মী নয়। সাহিত্যচর্চা করে অথচ ভাষা-আন্দোলনের প্রতি কোন শ্রদ্ধা নেই। সাহিত্যের ভক্ত কিন্তু ভাষা-আন্দোলনের প্রতি বিরক্ত। তার বক্তব্য হলো:

"— আমরা হলাম সাহিত্যিক। সমাজের আর দশটা লোক, মিছিল বা শোভাযাত্রা বের করে পুলিশের লাঠি খেয়ে প্রাণ দিলে কিছু এসে যায় না। কিন্তু আমাদের মৃত্যু মানে দেশের এক একটা প্রতিভার মৃত্যু।৯০

—এটা বজলে হোসেনের স্বার্থপর, দায়িত্বজ্ঞানহীন, অহঙ্কারী উচ্চারণ।

বজলে ভালোবাসে নারীর দৈহিক সৌন্দর্য, হৃদয়-সৌন্দর্য নয়। তার ভেতরে হৃদয়তৃষ্ণা নেই, আছে রূপতৃষ্ণা। ডলিকে সে ভালোবাসেনি, ভালোবেসেছে তার রূপ-ঐশ্বর্য। বজলেকে একদা ডলি প্রশ্ন করেছে:

"আচ্ছা হাসু ভাই। রোজ তুমি কেন এখানে আস বলতো?

বজলে ইতস্তত করে বললো, যদি বলি তোমাকে দেখতে।

— — — —

দেখাবার মতো কি আছে আমার?

তোমার রূপ, তোমার সৌন্দর্য। নরম গলায়

জবাব দিলো বজলে।"৯১

—বজলের উচ্চারণে কোন ভালোবাসা নেই। দুর্বার রূপাসক্তিতে সে বার বার প্ররোচিত হয়েছে। মাহমুদের নির্জন ঘরে ডলিকে আলিঙ্গনে উদ্যোগী হয়েছে। শুধু তাই নয় সাহানার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছে অসংকোচে।

বজলে নারী-লিপ্সু কিন্তু অর্থ-লিপ্সু নয়। অর্থের বিনিময়ে মাহমুদের গোয়েন্দাগিরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। জীবন সম্পর্কে তার নিজস্ব দর্শন হলো: 'কারও ক্ষতি সাধন না করা, অপরের অনিষ্ট থেকে সতর্ক থাকা এবং উপদ্রবহীন সুন্দর জীবনযাপন।' তার এ দর্শনটি খুব সুন্দর। কিন্তু জীবনদর্শনের সাথে তার নারীদর্শনের কোন সঙ্গতি নেই।

বজলের বন্ধু মাহমুদ, এককালের সাহিত্যকর্মী, বর্তমানে গোয়েন্দা-কর্মী। উভয়ের মানসিক আদর্শ প্রায় অভিন্ন। তারা দু'জনেই সাহিত্যিক এবং নারী লিপ্সু।[৯২] তবে রমনীবিহারে মাহমুদ অধিক পারদর্শী। সে ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে টালি ক্লার্কের মেয়ে সালেহাকে, বিয়ে করার অঙ্গীকার করেছে সাহানাকে। দু'টি মেয়েই হয়েছে কলুষিত। সালেহা করে আত্মহনন, আর সাহানা হয়েছে প্রত্যাখ্যাত। এসব পাপাচারে মাহমুদ অনুতপ্ত নয়, বরং উৎফুল্ল।

কোন গোয়েন্দাকর্মীর ভূমিকা আন্দোলন অনুকূল নয়। গোয়েন্দাকর্মী কখনও আন্দোলনকর্মীর প্রিয় হতে পারে না। তাই মাহমুদ হয়ে পড়েছে আন্দোলনকর্মী জহির রায়হানের অপ্রিয়। মাহমুদের নৈতিক চরিত্র নির্মাণে লেখকের সেই মনোভঙ্গি অস্পষ্ট থাকেনি।

কবি রসুল একজন পুরনো আন্দোলনকর্মী, বায়ান্ন সালের ভাষা-শহীদের সহকর্মী। ঘটনাবর্তের প্রাসঙ্গিক অবসরে কবি রসুলের পরিবেশনায় উপস্থাপিত হয়েছে বায়ান্নার একুশের ঘটনাংশ। তাই একুশের চৈতন্যের সমগ্রতা নির্মাণে চরিত্রটি হয়েছে তাৎপর্যবহ।

সীমান্তের শক্তিমান ছাত্র ওসমান পাঠকের মনকে স্পর্শ করে যায় ক্ষণিক অবসরে। তার মাতৃভাষা বাংলা নয়, উর্দু। তবুও উর্দুই হয়েছে বাংলা ভাষার পক্ষে প্রতিবাদী। প্রবল দৈহিক শক্তি আর অফুরন্ত সাহসে ওসমান খান পুলিশী সংঘর্ষের মোকাবেলা করেছে। রানু, বেণু, নানা- তাদের বিস্তৃতি নেই, কিন্তু তাৎপর্য আছে। আন্দোলনের কর্মী হিসেবে তাদের উপস্থিতি অত্যন্ত উজ্জ্বল।

বরফ গলা নদী

১৯৬৯ সালে প্রকাশিত 'বরফ গলা নদী' জহির রায়হানের বৃহত্তম উপন্যাস। এর আগে উপন্যাসটি 'উত্তরণ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। আরেক ফাল্গুনের রাজনৈতিক বৃত্ত ছেড়ে জহির রায়হান এখানে নগর-জীবনবৃত্তে হলেন সুস্থির। আবার তিনি ফিরে এলেন শেষ বিকেলের মেয়ে আর

তৃষ্ণার মতো নগরজীবনের নিম্নমধ্যবিত্ত ভুবনে। শেষ বিকেলের মেয়ে, তৃষ্ণা এবং বরফ গলা নদী নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী। তবে তৃষ্ণার জীবনস্তর অপেক্ষাকৃত নিম্নে। শেষ বিকেলের মেয়ে-তে হৃদয়িক সংকট আর তৃষ্ণা ও বরফ গলা নদীতে রয়েছে আর্থিক সংকট। শেষ বিকেলের মেয়ে-র কাসেদ, সালমা, শিউলি, এমনকি মৌনব্রতী নাহারও হয়েছে হৃদয়গত সংকটে আক্রান্ত। তৃষ্ণায় অর্থ-সংকটের অভিঘাতে মার্থা ও শওকতের জীবনের স্বপ্ন-তৃষ্ণা হয়েছে বিচূর্ণ, বিপর্যস্ত। অপরদিকে বরফ গলা নদীর মাহমুদ, মরিয়ম, মা-বাবা, আমেনা-শাহাদাত হয়ে পড়েছে আর্থিক সংকটবিক্ষত।

জহির রায়হান বরফ গলা নদীতে ব্যবহার করেছেন সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ। তাঁর এই দৃষ্টিকোণ হয়েছে সর্বত্রগামী। কিন্তু ঘটনাবর্তে দৃষ্টিকোণ প্রয়োগে মাঝে মাঝে এসেছে রূপান্তর। কখনও মাহমুদ, কখনও মরিয়মের দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে তাদের সমস্যার গুরুত্ব অনুসারে।

বরফ গলা নদীর প্লটবয়নে জহির রায়হান নির্মাণ করেছেন এক নতুন প্রয়োগকৌশল। গল্পাংশটি তিনটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত: উপসংহারের আগে, তারও আগে যা ঘটেছিল এবং উপসংহার। উপসংহারের আগে অংশটি দিয়ে উপন্যাসের সূচনা। এখানে একটি নাটকীয় উৎকণ্ঠা নিয়ে পাঠক অবতীর্ণ হয় "তারও আগে যা ঘটেছিল" অংশে। তারপরও সর্বশেষ এসেছে 'উপসংহার'। 'উপসংহারের আগে' ও 'উপসংহার'- অংশ দু'টির মাঝে প্রায় পাঁচ বছরের ব্যবধান। 'তারও আগে যা ঘটেছিল' ঘটনাংশটি অত্যন্ত সুকৌশলে এই ব্যবধান পূরণ করেছে। ফলে তৃষ্ণার মতো এ উপন্যাসেও প্লট পরিবেশনায় ব্যবহৃত হযেছে 'ফ্লাশব্যাক' পদ্ধতি।

হাসমত আলীর পরিবারকেন্দ্রিক মূল কাহিনীতে শাহাদাত পরিবারের ঘটনা অন্যতম পার্শ্বকাহিনী হিসেবে বিবেচিত। ব্যাপক স্ফীতি এ পার্শ্ব-কাহিনীটিকে চালিত করেছে স্বতন্ত্র গল্পের পথে। এই গল্পাংশ এবং মূল কাহিনীর মধ্যে যোগসূত্র যোজনা করেছে একমাত্র মাহমুদ। ফলে গল্পাংশটি পার্শ্বকাহিনী হিসেবে অনিবার্যভাবে মূল প্লট-সংশ্লিষ্ট হতে পারেনি।

উপন্যাসের শিরোনাম-নিহিত বক্তব্য ধারণ করেছে মাহমুদ। সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ঘটনাবর্তে তার সম্পৃক্তি সঙ্গতভাবে প্রত্যাশিত। অথচ 'তার আগে যা ঘটেছিল' অংশে মরিয়মের উপস্থিতি এবং তার ঘটনা-সম্পৃক্তি হয়ে উঠেছে বিশেষ গুরুত্ববহ। মনসুরের সাথে মরিয়মের পরিচয়ের পর থেকেই কাহিনী যেন নির্মাণ করেছে ভিন্ন আরেকটি বৃত্ত। ঘটনাবর্তে অতীতের

স্মৃতিদগ্ধ মরিয়মের অন্তর-উন্মোচন, মনসুরের সাথে প্রণয়, পরিণয় এবং মর্মান্তিক বিপর্যয়ের মাধ্যমে ঘটেছে এ অংশের (তারও আগে যা ঘটেছিল) পরিসমাপ্তি। ফলে মাহমুদকেন্দ্রিক কাহিনী হয়ে উঠেছে অনেকাংশে মরিয়মকেন্দ্রিক।

কাহিনীর একটি বিশেষ পর্যায়ে, 'তারও আগে যা ঘটেছিল' পর্বের শেষাংশে জহির রায়হান অবতারণা করেছেন শোচনীয় একটি মৃত্যুদৃশ্য। অনাবশ্যক মৃত্যুদৃশ্য উপন্যাসটির রসহানি ঘটিয়েছে।[৯৩] উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ যখন সংকটাপন্ন, তখনই ঘরের ছাদ ধসে একমাত্র মাহমুদ ছাড়া গোটা পরিবার হয়েছে মৃত্যুকবলিত। কলকাতায় বি.এ. পাশ একটি মেয়েসহ পুরো পরিবার পুরনো বাড়ীর ছাদ ধসে ধ্বংস হয়। উপন্যাসের সাথে ঘটনাটির একটি বিশেষ সাদৃশ্য সহজেই আবিষ্কার করা যায়।[৯৪] এই সাদৃশ্য জহির রায়হানের শিল্প-সিদ্ধান্তকে করেছে বিপন্ন ও বিক্ষত।

"তারও আগে যা ঘটেছিল'' পর্বের শেষাংশে মর্মান্তিক বিপর্যয়ের পর:

> "বালিশে মুখ গুঁজে ডুকরে কেঁদে উঠলো মাহমুদ। এই প্রথম চোখ ফেটে কান্না এলো তার। বেদনাজড়িত গলায় সে বললো, কেন এমন হলো বলতে পারেন, কেন এমন হলো? আমার যে কেউ রইলো না আর, কেউ না, আমি কেমন করে বাঁচবো।
>
> ধীরে ধীরে মুখখানা ওর মাথার উপর নাবিয়ে আনলো লিলি। দু'চোখে অশ্রু ঝরছে তার। কান্না ভরা গলায় সে কানে কানে বললো, আমি আছি, আমি যে তোমার, ওগো বিশ্বাস করো। আমি আছি, ওগো একবার মুখখানা তুলে তাকাও আমার দিকে, একবার চেয়ে দেখো।"[৯৫]

স্বজনহারা শোকদগ্ধ, অসহায় মাহমুদের প্রতি কেবল সমবেদনা কিংবা সহানুভূতি নয়, লিলির এ-উচ্চারণ বহন করে ভিন্ন সংকেত, ঘটনাবর্তে কোথাও যার সমর্থন নেই। কেবলমাত্র জহির রায়হানের রোমান্টিক দৃষ্টির প্রবর্তনায় উপন্যাসের এ অংশ হয়ে উঠেছে অস্বাভাবিক এবং মেলোড্রামাটিক।[৯৬]

লেখকের অভিপ্রায়কে ধারণ করেছে মাহমুদ। আর্থিক সংঘাতে বিক্ষত বরফকঠোর মাহমুদের সজল-কোমলতায় রূপান্তরই হলো লেখকের অভিপ্রায়। উপন্যাসের শিরোনামে এই বক্তব্যটি হয়েছে ইঙ্গিতময়। ফলে এ দিক দিয়ে চরিত্রটি বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত।

মাহমুদ নীতিবান, ন্যায়পরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ। ন্যায় ও নীতিনিষ্ঠায় তার ব্যক্তিত্ব হয়েছে অনমনীয়, প্রস্তরকঠোর ও অবিচল। বন্ধুর অসঙ্গত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, বিকৃত সংবাদ পরিবেশনার প্রতিবাদে সাংবাদিকতা থেকে পদত্যাগ করে, বিত্তবান মনসুরের কৃপায় আহত হয় এবং দুশ্চরিত্র বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা থেকে বিরত থাকে।

জহির রায়হানের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা থেকে মাহমুদ চরিত্রটি নির্মিত।[৯৭] মাহমুদ মিলন পত্রিকার অত্যন্ত স্বল্প বেতনের সাংবাদিক। সুস্থ সাংবাদিকতা তার আদর্শ। আকাংক্ষা ছিল খ্যাতিমান সাংবাদিক লুই ফিসারের পদাঙ্কচারী হবে। সাংবাদিকতার আদর্শহীনতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সে। টাকা থাকলে একটি আদর্শ পত্রিকা প্রকাশের কথা ভাবে মাহমুদ।

দারিদ্র্যদীর্ণ পরিবারের সন্তান মাহমুদ কখনও আর্থিক সংকটমুক্ত নয়। আর্থিক-সংগ্রামে অতিবাহিত হয়েছে ছাত্রজীবন। বি.এ. পাশ করেও স্বচ্ছলতা আসেনি। আর্থিক সংকটতাড়িত মাহমুদ বিত্তবানদের প্রতি অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ, এমনকি স্রষ্টার প্রতিও বিরূপ। ধনিক শ্রেণী কোন না কোন ভাবে শোষক। এ সম্পর্কে মাহমুদের বক্তব্য:

> "এ দেশে কটা লোক আছে যে, তার চরিত্র ঠিক রেখে বড়লোক হতে পেরেছে? অন্যকে ফাঁকি দিয়ে ধোকাবাজি আর লাম্পট্য করে, শোষণ আর দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে টাকা রোজগার করে বড়লোক হয়েছে সব, তাদের আবার চরিত্র।''[৯৮]

তার এ উচ্চারণ অত্যন্ত নির্ভুল। কিন্তু তা রাজনীতিসম্পৃক্ত। অথচ মাহমুদ রাজনীতি-সম্পৃক্ত নয়। এটা রাজনীতিসচেতন জহির রায়হানের আরোপিত বক্তব্য বলে মনে হয়।

মাহমুদের ব্যবহার, কথাবার্তা অত্যন্ত রুক্ষ। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব ও বিশ্রামাগারের খোদা বক্স- সকলের প্রতি তার ব্যবহারটা অত্যন্ত নিরস ও কর্কশ। আর্থিক সংঘাত-তাড়িত মাহমুদ হয়ে উঠেছিল প্রস্তরকঠোর ও নির্মম। কিন্তু আপাতঃ কঠোর মাহমুদ আসলে মমতাহীন নয়। বোনদের সে উপহার দেয় চুলের কাঁটা, লাল ফিতে, বোনের বিয়েতে অগ্রিম বেতনের সমস্ত টাকা তুলে দেয় বাবার হাতে। 'উপসংহার' অংশে অসুস্থ আমেনার চিকিৎসায় হয়ে ওঠে উদ্যোগী। তার অন্তরানুভূতির প্রকাশটি ছিল নিরস, কর্কশ, কোমল- মধুর নয়।

আর্থিক যন্ত্রণাবিদ্ধ মাহমুদ-এর হৃদয়াবর্ত আপাতঃ আচ্ছাদিত থাকলেও তা অসংকেতিক থাকেনি। লিলিকে প্রথম দেখার পর মাহমুদের কৌতূহল:

"মাথা নেড়ে ওকে যেতে নিষেধ করলো মাহমুদ। বললো, তোমার সাথে যে মেয়েটি আজ এসেছিল সে কে জানতে পারি কি? অবশ্য তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে।
মরিয়ম বললো, ওর নাম লিলি, আমার সঙ্গে পড়তো কলেজে।
মাহমুদ বললো, থাক, তার নাম আমি জানতে চাইনি। জানতে চেয়েছিলাম ওর সাথে তোমার সম্পর্কটা কি, জেনে খুশী হলাম।"৯৯

পরবর্তীকালে ঘটনাচক্রে মাহমুদের ভাবনায় লিলির ছায়াপাত: "মাহমুদের মনে হলো, নামটাও এর আগে কোথাও শুনেছে সে। কার মুখে যেন শুনেছিল? দূর তোর জাহান্নামে যাক মেয়েটা। দু'হাতে মুখ ঢেকে নীরবে ভাবতে লাগলো মাহমুদ। কোথায় গেলে সে আশু একটা চাকুরী পেতে পারে।"১০০

সংকটবিদ্ধ মাহমুদের লিলিকেন্দ্রিক ভাবনা অবশ্য অধিক দূর অগ্রসর হতে পারেনি। 'তারও আগে যা ঘটেছিল' পর্বে শেষাংশে মর্মান্তিক বিপর্যয়ে শোকতপ্ত অসহায় মুহূর্তে লিলির স্পর্শে মাহমুদের অন্তর হয়েছে উন্মোচিত। এ অংশে লিলির অতিনাটকীয় সংলাপ অস্বাভাবিক হলেও মাহমুদের অসহায় মুহূর্তের জন্য তা ছিল বিশেষ অনুকূল।

মনসুর বিত্তবান পরিবারের সন্তান। ফলে তার চিত্ততারল্য অসঙ্গত নয়। মরিয়মের প্রতি তার আচরণ 'গায়ে পড়া' অথচ কৌশলী। মরিয়মের অসুস্থতা এবং তাদের দারিদ্র্যের সুযোগে মনসুর তার বিত্তকে সুকৌশলে ব্যবহার করেছে। এই কৌশল শেষ পর্যন্ত তাকে করেছে লক্ষ্যস্পর্শী।

প্রথমে মরিয়মের প্রতি হৃদয়-দৌর্বল্যের কথা প্রকাশ করতে পারেনি। একদা সংকটাপন্ন মরিয়মের প্রশ্নবিদ্ধ মনসুর উচ্চারণ করেছে:

"—আমি আপনাকে ভালোবাসি।– জীবনে এই প্রথম একটি মেয়েকে ভালোবেসেছি আমি। — আপনি হয়ত মনে মনে ঘৃণা করতে পারেন আমাকে। কিন্তু যেদিন প্রথম দেখি সেদিনই ঠিক করেছিলাম আমি আপনাকে বিয়ে করবো।"১০১

—প্রথম দর্শনেই বিয়ের সিদ্ধান্ত— মরিয়মের প্রতি মনসুরের এই বক্তব্য উচ্চারণে হৃদয়বোধের গভীরতার কোন পরিচয় নিহিত নেই। এটা হয়ে উঠেছে তার বিত্তের চিত্ততারল্য নির্দেশক।

মনসুর-মরিয়মের দাম্পত্য-জীবন হয়েছে স্বল্পস্থায়ী, মরিয়মের অতীত জীবনের একটি অনিবার্য দুর্ঘটনা মনসুরকে করেছে আহত ও ক্রোধবিদ্ধ। এটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু স্ত্রী মরিয়মকে অসংকোচে বিতাড়িত করলো

অথচ তার ভালোবাসাসিক্ত অন্তর এক মুহূর্ত বিচলিত হল না। এটাও তার চিত্তুতারল্যের অপর প্রান্ত।

মরিয়মের মর্মান্তিক মৃত্যু মুহূর্তের জন্য মনসুরের অন্তরকে স্পর্শ করেনি। মাহমুদের প্রতি তার সমবেদনা আছে, অথচ ভালোবেসে বিয়ে করা স্ত্রী মরিয়মের মৃত্যুতে তার কোন বেদনাবোধ নেই। এ অংশে চরিত্র-নির্মাণে জহির রায়হানের শিল্পবোধ হয়েছে বিক্ষত।

মরিয়ম সজীব স্বাভাবিক প্রাণপদার্থে গঠিত একটি চরিত্র। সে নির্মিত চরিত্র নয়, হয়ে ওঠা চরিত্র। ঘটনাবর্তে স্বাভাবিক বর্ণে হয়েছে অনুরঞ্জিত। মরিয়ম দারিদ্যদীর্ণ কিন্তু হৃদয়দীর্ণ নয়। আর্থিক সংকটে কর্মশীল, স্নেহ-মমতায় সে হৃদয়বতী। পিতা-মাতা, ভাই-বোন সকলের প্রতি সে প্রাণোত্তাপে সমদর্শী।

জাহেদের স্মৃতিবিক্ষত মরিয়ম মনসুরের প্রতি স্বাভাবিক হতে পারে না। প্রতারণাময় স্মৃতিদীর্ণ মরিয়ম হয়ে ওঠে পুরুষ-বিরূপ। এ বিরূপতা রুক্ষতায় প্রকাশিত। স্বভাবধর্মে সে রুক্ষ নয়, রুক্ষতা ব্যবহৃত হয়েছে তার আত্মরক্ষায়। মনসুরের প্রতি রুক্ষতা প্রদর্শন করে সে নিজেই হয়েছে আহত। ঘটনাবর্তে মনসুর-বিরূপ মরিয়মের হয়েছে স্নিগ্ধ অন্তর-উন্মোচন। এ স্থলে জহির রায়হানের শিল্পকৌশল হয়েছে সাফল্যচারী।

বিয়ের পর স্বামীর প্রশ্নবিদ্ধ মরিয়ম একদা অকপটে তার অতীতকে উন্মোচন করে। দুইবার ভালোবাসার অপরাধ তার কাছে অবোধ্য। জাহেদের প্রতি ভালোবাসা যেমন সত্যি, মনসুরের প্রতি ভালোবাসা তেমনি সত্যি। জাহেদ স্মৃতি, মনসুর বাস্তব। জাহেদ অতীত, মনসুর বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। জাহেদ মিথ্যে, মনসুর সত্য। এই বিশ্বাসের সারল্যে মরিয়ম হয়েছে স্বামীর বিরাগভাজন এবং স্বামীগৃহ থেকে বিতাড়িত। তবুও সে থেকে যায় সরল, অকপট, মুখোশহীন এবং সত্যনিষ্ঠ।

অবমাননা ও অভিমানতপ্ত মরিয়মের পিতৃগৃহে রাত্রির নির্ঘুম প্রহর কাটে। শয্যায় শুয়ে শুনতে পায় বাইরে বৃষ্টির শব্দ। বৃষ্টির শব্দে মরিয়ম হয়ে ওঠে সজল-কোমল। বৃষ্টির ব্যঞ্জনা এখানে চরিত্রসৃজনে হয়েছে সহায়ক। মরিয়ম সিদ্ধান্ত নেয়, অশুভ অতীতকে ভিক্ষে চাইবে স্বামীর কাছে। এটা তার করুণ প্রার্থনা নয়, স্নিগ্ধ হৃদয়বত্তার শান্তির প্রয়াস। ভালোবাসার গভীরতায় স্বামীর জীবনকে ভরিয়ে তোলবার সংকল্প।

লিলি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও বাস্তববাদী চরিত্র। সে কঠোর বাস্তববাদী অথচ কোমল হৃদয়বতী। হৃদয়বোধে ও বাস্তববোধে পরিপুষ্ট ও বিশিষ্ট। জীবনে একাধিকবার প্রেমচর্চা অপরাধ নয় এটা লিলির অন্তরগত বিশ্বাস। মরিয়মের

সাথে এ বিশ্বাসের সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু তার স্বীকারোক্তি লিলির ভেতরে নেই। প্রেমের ক্ষেত্রে মরিয়ম অকপট, মুখোশহীন। লিলি মুখোশধারী। তাই বলে লিলি মিথ্যাচারী নয়, বাস্তববাদী— যে বাস্তব-বুদ্ধির অভাবে মরিয়মের দাম্পত্য জীবন হয়েছে দুঃখময়।

মাহমুদের প্রতি লিলির হৃদয়বোধ অপরাধ নয়। কিন্তু ঘটনাবর্তে তা আকস্মিক। মাহমুদ-সম্পৃক্ত হৃদয়দৌর্বল্যের কোন সংকেত লিলি চরিত্রে স্পষ্ট নয়। ফলে 'তারও আগে যা ঘটেছিল' পর্বের শেষাংশে শোকাচ্ছন্ন মাহমুদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত সংলাপটি হয়েছে অস্বাভাবিক ও অতিনাটকীয়:

> ''আমি আছি, আমি যে তোমার ওগো, বিশ্বাস করো।
>
> 'আমি আছি, ওগো একবার মুখখানি তুলে তাকাও আমার দিকে, একবার চেয়ে দেখো।"১০২

হাসিনা প্রাণচঞ্চল একটি কিশোরী। দুরন্তপনায় ও উচ্ছলতার চরিত্রটি হয়ে উঠেছে সতেজ ও স্বাভাবিক। হাসিনার গাত্রবর্ণ শ্যামলা। অথচ নিজেকে সকলের চেয়ে সুন্দরী প্রমাণের প্রয়াস হয়েছে উপভোগ্য। তার চলনে বলনে কিশোরীসুলভ চপলতা হয়ে উঠেছে সজীব, স্বাভাবিক। ক্যামেরার ছবি তোলার কৌশল আয়ত্ত করতে গিয়ে সে তসলিমের সান্নিধ্যবর্তী হয়। অল্প দিনেই গড়ে ওঠে তাদের অন্তরঙ্গতা। একদা তসলিমের স্পর্শে শিহরণতাড়িত হাসিনার উচ্ছলতা হয়ে ওঠে উষ্ণপ্রাণময়।

হাসমত আলী ও সালেহা বেগম দরিদ্র সন্তানবৎসল পিতা-মাতা। তারা সন্তানের প্রতি আত্মিক দায়িত্ব পালনে যতটা সক্ষম, আর্থিক দায়িত্ব পালনে ততটা অক্ষম। আর্থিক অক্ষমতায় তারা বেদনাবিদ্ধ ও ব্যক্তিত্বদুর্বল। জামাই মনসুরের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ মর্যাদাহানিকর- এ চৈতন্য তাদের ভেতরে অনুপস্থিত। দারিদ্র্যের তাড়নায় তাদের আত্মমর্যাদাবোধ হয়েছে বিপন্ন। জামাই-এর অর্থানুকূল্যে তাদের বাসা বদল হবে, আসবে স্বচ্ছলতা— এ স্বপ্নে তারা অবাধে বিচরণ করে।

শাহাদাত প্রেমে যতটা সবল আত্মমর্যাদাবোধে ততটা দুর্বল। আমেনার সাথে তার বিয়েটা ছিল প্রেমের। তাদের দাম্পত্যজীবনও ছিল সুখের। শাহাদাতের গোপন প্রত্যাশা ছিল যে, আর্থিক দুঃসময়ে স্ত্রী আমেনা তার বিত্তবান ভাইদের অর্থানুকূল্য কামনা করবে। অর্থ-সংকটে বিপন্ন শাহাদাতের আত্মমর্যাদাবোধ হয়ে পড়েছে দুর্বল। স্ত্রী আমেনার প্রতি তার ভালোবাসা অত্যন্ত গভীর ও অন্তরস্পর্শী।। মাহমুদকে লেখা চিঠিতে তার সত্য নিহিত রয়েছে:

"সারাটা জীবন ও শুধু আমাকে দিয়ে গেলো। ওকে আমি কিছু দিতে পারলাম না। দোয়া কর ওর সঙ্গে সঙ্গে আমিও যেন কবরে যেতে পারি। এ দুনিয়াতে এর চেয়ে বড় কোন চাওয়া কিংবা পাওয়া আর নেই আমার।"[১০৩]

আমেনা অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময়ী। ভাইদের মতামতকে উপেক্ষা করে শাহাদাতকে বিয়ে করেছিল। এই আর্থিক দুঃসময়ে ভাইয়ের কৃপাপ্রার্থী হতে চায়নি। অর্থ-সংকটেও তার আত্মমর্যাদা অবিচল। শাহাদাত ও সালেহা বেগমের চেয়ে আমেনা আত্মমর্যাদাবোধে অত্যন্ত সবল ও অবিচল। এ দিক দিয়ে মাহমুদের সাথে তার সাদৃশ্য স্পষ্ট। আমেনা নিঃশেষিত হয়েছে কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত থেকেছে নিরাপস।

আর কতদিন

আর কতদিন জহির রায়হানের একটি ক্ষুদ্রাকৃতির উপন্যাস। লক্ষণীয় যে, পূর্ববর্তীর তুলনার পরবর্তী উপন্যাসসমূহ অবয়বগত দিক থেকে হয়ে পড়েছে ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ততর। আর কতদিন ১৯৭০ সালে 'সচিত্র সন্ধানী' পত্রিকার বর্ষ শুরু সংখ্যায় নভেলেট আঙ্গিকে প্রথম প্রকাশিত। পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশনার পর ১৯৮১ সালে রচনাবলীর দ্বিতীয় খন্ডে হয়েছে অন্তর্ভুক্ত।

বরফগলা নদী উপন্যাসের মতো আর কতদিন রচনার একটি উৎস আবিষ্কার করা যায়। "৪৬-এর দাঙ্গার সময় জহিরের দূর সম্পর্কের আত্মীয় একটি মুসলমান পরিবার প্রায় বিশ দিন একটি পায়খানা ঘরে আত্মগোপন করেছিলেন। ঐ বাড়ীর দোতলায় বসবাসরত জনৈক খ্রিস্টান মহিলার সহায়তায় তারা প্রাণরক্ষা করেন। এই ঘটনাকে আশ্রয় করে তাঁর অসমাপ্ত ছায়াছবির কাহিনী *Let There be Light* বা আর কতদিন সৃষ্টি হয়।"[১০৪] এই খ্রিস্টান মহিলার সাথে নভেলেটের আশ্রয়দাত্রী বৃদ্ধা মাতার সাদৃশ্য আবিষ্কার করা কঠিন নয়। ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতার প্রবর্তনার রচিত এই নভেলেটে জহির রায়হান অবতরণ করলেন এক নতুন শৈল্পিক ভুবনে। এখানে জীবন শিল্পিত হয়নি, শিল্পিত হয়েছে বক্তব্য। জীবন গভীরতা থেকে জহির রায়হান অবতরণ করলেন বক্তব্যের গভীরে। নভেলেটটির প্রতিপাদ্য হলো, বিশ্বব্যাপী শোষিত, নিপীড়িত মানুষের কোন জাত নেই, ধর্ম নেই, বর্ণ নেই, সকলে একই শ্রেণীভুক্ত।

আর কতদিন উপস্থাপনায় জহির রায়হান ব্যবহার করেছেন সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ। তবে এ দৃষ্টিকোণ ঔপন্যাসিকের নয়, চিত্র-নাট্যকারের। নভেলেটটির সারা শরীর অনেকাংশে চিত্র-নাট্যিক লক্ষণে চিহ্নিত। বর্ণনা অপেক্ষা সংলাপের ব্যবহার অধিক এবং বর্ণনাংশটি দৃশ্য-নির্দেশনার ভূমিকা নিয়েছে। মূলতঃ জহির রায়হান *Let There be Light* নামে একটি

চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে নভেলেটটির প্লট পরিকল্পনা করেছিলেন। এ কারণে এটা চিত্র–নাট্যের এত নিকটবর্তী।

আর কতদিনের অবয়ব সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রেক্ষাপট বিস্তৃত। বিশেষ কোন দেশকাল নয়, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নির্মিত হয়েছে একটি আন্তর্জাতিক চৈতন্য। মানুষ নির্যাতন করে মানুষকে। মানুষ মানুষের সাথে করে বৈরী আচরণ। মানুষ তৃষ্ণা মেটায় মানুষের রক্তে বিচিত্র পন্থায়:

> "···মানুষ মানুষকে হত্যা করে
> ধর্মের নামে।
> বর্ণের নামে।
> জাতীয়তার নামে।
> সংস্কৃতির নামে।"১০৫

—মানুষ মানুষকে বিপন্ন করে। গৃহহারা করে, করে সর্বহারা। আর কত–দিনে জহির রায়হান এই নির্মম সত্যটি আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছেন।

হিংস্র বর্বরতা, শোষণ আর নির্যাতনের নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে বুখেনওয়াল্ড, স্টালিনগ্রাড, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, গ্রীস, সাইপ্রাস, জেরুজালেম, হিরোসীমা, ভারত, পাকিস্তানের অসংখ্য মানুষ। এইসব মানুষ একই মিছিলে সমবেত। আর এই মিছিলের সাথে জহির রায়হান অনুভব করেন বিড়িত একাত্মতা:

> "ওরা আমার ছেলেটাকে হত্যা করেছে হিরোসীমায়।
> ওরা আমার মাকে খুন করেছে জেরুজালেমের রাস্তায়। আমার বোনটাকে ধর্ষণ করে মেরেছে ওরা আফ্রিকাতে।
> আমার বাবাকে মেরেছে বুখেনওয়াল্ডে গুলী করে। আর আমার ভাই। তাকে ওরা ফাঁসে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে। কারণ সে মানুষকে ভীষণ ভালোবাসত।"১০৬

জহির রায়হানের এই একাত্মতা, মানবতা এবং আন্তর্জাতিকতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁর মধ্যে মানবতা আছে, প্রতিবাদ নেই। বিক্ষত মানুষের আর্তনাদ অন্তরকে স্পর্শ করে অথচ প্রতিবাদী চেতনাকে জাগ্রত করে না। বিপন্ন মানুষের সমস্যা আছে কিন্তু তা নিরসনের পথনির্দেশনা নেই। তবে পৃথিবীর এইসব মানুষের চলমান মিছিলের একটি গন্তব্য নির্দেশ আছে। তাদের গন্তব্য হলো:

> "আমরা অন্ধকার তেকে আলোতে যেতে চাই।
> আমরা আলো চাই।"১০৭

'আলো' আর 'অন্ধকার' শব্দ দুটি এখানে বিশেষ তাৎপর্যবহ। অন্ধকার পীড়ন সম্পৃক্তি আর 'আলো' পীড়ন মুক্তির প্রতীক। শোষণ আর পীড়নের হিংস্র অন্ধকার থেকে তারা যেতে চায় আলোতে, যেখানে হিংস্র অন্ধকারের কোন উপদ্রব নেই। মিছিলের মানুষেরা তাই আলোকের অভিযাত্রী। এই অভিযাত্রা নিঃসন্দেহে মহৎ। কিন্তু সে যাত্রাপথ নিষ্কন্টক নয়। অথচ সেই কন্টকমুক্তির কোন চৈতন্য এখানে সংকেতিত হয়নি।

আর কতদিনের গল্পাংশ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। গল্পাংশে বিস্তৃতি নেই, কিন্তু বক্তব্যের বিধৃতি আছে। বক্তব্য বিধৃতির কারণে চরিত্র সৃষ্টি হয়নি। আর লেখকও চরিত্র–সৃজনে আগ্রহী ছিলেন না। চরিত্র সৃষ্টি না হলেও সৃষ্টি হয়েছে কতগুলি মহামুহূর্ত। মুহূর্ত সৃজনে বক্তব্য হয়েছে ব্যঞ্জনাসিক্ত, আবেদনময়। একটি বদ্ধঘরে আত্মরক্ষারত উনিশ জন বিপন্ন মানুষ শুনতে পায় মৃত্যুর পদধ্বনিঃ

> "আর সেই মুহূর্তে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাটির প্রসব বেদনা উঠেছে। একটি সন্তানকে জন্ম দিচ্ছে সে।
> উনিশজন মৃতপ্রায় মানুষ চরম উৎকণ্ঠার সঙ্গে শিশুটি জন্ম প্রতিরোধের আপ্রাণ চেষ্টা করেছে।
> না। না। এখন নয়।
> এখন নয়।
> মুমূর্ষু মহিলাটি যন্ত্রণার অস্থিরতায় বার বার নিজের ঠোঁট কামড়াচ্ছে আর ঘর্মাক্ত দেহটা আয়ত্তে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। সেও চায়না এই মুহূর্তে শিশুটির জন্ম হোক। কিন্তু। সবাইকে হতাশ করে দিয়ে উনিশ জন মানুষের অভিসম্পাৎ কুড়োতে কুড়োতে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হলো।
> আর সঙ্গে সঙ্গে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে উনিশ জনের একজন সেই বাচ্চাটির গলা টিপে ধরলো। নীচে মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ওরা এখন আশ্রিত মানুষগুলোকে খুঁজছে। প্রসূতির চোখ জোড়া পৃথিবীর প্রতি ঘৃণায় একবার কুঞ্চিত হলো। তারপর বিবর্ণ মণিতে প্রাণের চিহ্ন রইলো না। আর বাচ্চাটার সঙ্গে সঙ্গে তার মাও মারা গেলো।
> মৃত মহিলার স্বামী হতবিহ্বল দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো সেদিকে। সহসা কান্নার আবেগে ভেঙ্গে পড়তে গিয়ে নিজেই নিজের মুখখানা দু'হাতে চেপে ধরলো।
> না। না। এখন নয়।
> এখন কান্নাও নয়।
> এখন শুধু নীরবে দু'টি মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করো আর নিজের আসন্ন মরণ সম্ভাবনার কথা ভেবে ঈশ্বরকে মনে মনে ডাকো।"১০৮

এছাড়া, আশ্রিত মানুষের একটি শিশুর হাসির কাছে তিন ভাইর হিংস্রতার পরাজয়, পানির অভাবে তৃষিত একটি শিশুর মৃত্যু-দৃশ্য এবং শেষাংশে রক্তসিক্ত পিতামাতার সাথে ইভা- তপুর সাক্ষাৎ দৃশ্যসমূহ হয়ে উঠেছে অন্তরস্পর্শী মহামুহূর্তসমষ্টি।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে বক্তব্যের গভীরতা নির্মাণে ও অন্তরমথিত মুহূর্ত সৃজনে 'আর কতদিন' হয়েছে মহিমাময়।

কয়েকটি মৃত্যু

'আর কতদিনে'র মতো 'কয়েকটি মৃত্যু' জহির রায়হানের আরেকটি ক্ষুদ্রাকৃতির উপন্যাস। নভেলেট অভিধায় চিহ্নিত হয়ে 'সচিত্র সন্ধানী' পত্রিকার ১৯৭১ সালের বর্ষ শুরু সংখ্যায় প্রথম মুদ্রিত এবং সন্ধানী প্রকাশনী থেকে ১৯৭৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ১৯৮১ সালে নভেলেটটি রচনাবলীতে অন্তর্ভুক্ত হয়।

পূর্ববর্তী নভেলেট আর কতদিনে যে সংক্ষিপ্ততার চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল, 'কয়েকটি মৃত্যু' হয়েছে তারই পদাঙ্কচারী। এটা জহির রায়হানের শেষতম সাহিত্য-নিদর্শন।

সর্বজ্ঞদৃষ্টিকোণে নভেলেটটি বিধৃত হলেও বর্ণনার বর্ণ সজ্জা অনেঁকাংশে অনুপস্থিত। মূল ঘটনাংশ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বর্ণনার ঐশ্বর্যে প্রাণময়, সৌন্দর্যময় ও শিল্পময় হয়ে ওঠে। কয়েকটি মৃত্যু সে গৌরব থেকে বহুলাংশে বঞ্চিত। কাহিনীটি ঋজু ভঙ্গিতে একান্ত ক্ষিপ্রতায় হয়েছে পরিণতিস্পর্শী। এই ক্ষিপ্রতা লেখকের সযত্ন পরিচর্যার অভাব প্রমাণ করে। অবশ্য যদিও এক রাত্রির সময় পরিসরে কাহিনীটি নির্মিত।

জহির রায়হান একদা শখ হিসেবে স্বপ্ন-বিজ্ঞান ও হস্তরেখা-বিজ্ঞান চর্চা করতেন।[১০৭] এই স্বপ্নতাত্ত্বিক প্রেরণা নভেলেটটির ভিত্তি নির্মাণ করেছে। মৃত্যু সংকেতময় দুঃস্বপ্ন দর্শনজনিত বাস্তব মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও তার সংস্কারাচ্ছন্ন শৃংখল মোচনের অভিপ্রায়ে গ্রন্থটি রচিত।

স্বপ্ন সব সময়ে মানুষের অচেতন- অবচেতন মনোলোকে সঞ্চিত স্মৃতি পুঞ্জের খেলা। নিদ্রাজনিত অবসরে তার আবির্ভাব। জীবনের কঠোর অন্তরায় অতিক্রমকারী, সকল প্রত্যাশাপূর্ণ, পরিতৃপ্ত, বর্তমানে নিস্তরঙ্গ জীবনচারী ষাট বছরের আহমদ আলী শেখের অবচেতন মানসলোকে মৃত্যুস্মৃতির ছায়াপাত অস্বাভাবিক নয়। বাইশ বছর পূর্বে পিতা ও পিতৃব্যের আকস্মিক মৃত্যুস্মৃতি তার মনের অবচেতন স্তরে ছিল সঞ্চিত। এতে ইন্ধনের স্পর্শ এনে দেয় পৌত্রের পরীক্ষা-প্রস্তুতির পাঠ্যাংশের আধ্যাত্মিকতাঃ

"আল্লাহ তা'লা বলিলেন, ইহাদের সেজদা করো। কিন্তু ইবলিশ তবু রাজী হইল না। ইবলিশ বলিলো, হে রাব্বুল আল আমীন। ইহারা মাটির তৈরী। আর আমাদের আপনি আগুন দ্বারা তৈরী করিয়াছেন। আমরা আগুনে তৈরী হইয়া কেন মাটির ঢেলাকে সেজদা করিবো।

জোহরা বেগমের গলার স্বরে বুড়ো কর্তার (আহমদ আলী শেখ) চমক ভাঙ্গলো।"[১১০]

এই অন্যমনস্কতা তার মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। এমন অবস্থায় পৌত্রের পঠন–ধ্বনির মধ্যে নিদ্রাচারী আহমদ আলীর শেখের স্বপ্নদর্শন হয়েছে অত্যন্ত স্বাভাবিক। মৃত্যু–সংকেতময় দুঃস্বপ্ন দর্শন তাকে করে তোলে আতংকিত ও আশংকিত। এই আশংকা অসুস্থ পুত্র শামসুকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। শংকাবিদ্ধ উত্তপ্ত–মস্তিষ্ক শামসুও গভীর রাতে দেখে দুঃস্বপ্ন। তাতেও সংকেতিত হয় মৃত্যুভীতি।

মৃত্যু সব সময় ভীতিপ্রদ। মৃত্যু তাই কোন মানুষের কাম্য নয়। মৃত্যু–ভীতি পরিবারের সকল সদস্যের অন্তর–গহ্বরকে করেছে কম্পিত ও আলোকিত। দুঃস্বপ্নের শংকাবিদ্ধ মানুষের আত্মকেন্দ্রিক সুপ্ত–সংকীর্ণ চৈতন্য উন্মোচনে[১১১] লেখক হয়ে উঠেছেন সাফল্যস্পর্শী।

একই রাতে আর একটি দুঃস্বপ্ন দেখলেন আহমদ আলী শেখ। এবারে স্বপ্নলোকের ছায়ামূর্তির প্রস্তাব, কোন দুই পুত্রের প্রাণ সংহার করা হবে তাকেই তা নির্ধারণ করতে হবে। পুত্র–স্নেহান্ধ আপন স্বার্থবোধ–তাড়িত পিতা আহমদ আলী শেখ উচ্চারণ করলেন:

"তুমি আমার দুই ছেলেকে না মেরে তাদের তিন তিনটে বউ আছে আমার ঘরে, তাদের তিনটে বউকে মেরে ফেলো।"[১১২]

শ্বশুরের কাম্য– মৃত্যু বর্ষিত হোক পুত্রবধূদের ওপর। পাশাপাশি পুত্রবধূরা বৃদ্ধ শ্বশুর আর অসুস্থ দেবর শামসুর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে হতে চায় শংকামুক্ত, নিরাপদ।

পরিবারের একমাত্র ব্যতিক্রম জননী জোহরা বেগম। তিনি ব্যতিক্রমী নন, অতিক্রমী চরিত্র। জহির রায়হান জননীকে অধিষ্ঠিত করেছেন সকলের ঊর্ধ্বে। জননীর মাতৃত্ব চিরন্তন, শাশ্বত। সে কেবল নিঃশেষে দান করে, গ্রহণ করে না:

"— জোহরা বেগম জায়নামাজে বসে বসে মোনাজাত করছেন।

ইয়া আল্লাহ্। কাউকে যদি মারতে হয় তাহলে সকলের আগে আমাকে মারো। আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। ইয়া আল্লাহ্। আমি বেঁচে

> থাকতে আমার ছেলে মেয়ের গায়ে হাত দিয়ো না। আমার স্বামীর গায়ে হাত দিয়ো না। ইয়া আল্লাহ্ আমি যেন তাদের সকলের কোলে মাথা রেখে মরতে পারি।"১১৩

—মরণভীতি, আত্মকেন্দ্রিক ভাবনা মাতৃত্বকে কখনও স্পর্শ করে না, মাতৃত্বকে কখনও পরাজিত করতে পারে না।

অপরদিকে শ্বশুরের মৃত্যুর পর সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে পুত্রবধূরা হয়ে ওঠে উৎকণ্ঠিত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। শুধু তাই নয়, জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূর ভাবনা— জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রাপ্য অংশ হওয়া উচিত সর্বাধিক।

শংকাতাড়িত আইনজীবী জ্যৈষ্ঠপুত্র মনসুর আলী আপন পেশাগত কর্মের বৈধতার ভাবনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। জগৎ সংসার মনে হয় বিস্বাদময় অর্থহীন। অতঃপর শংকিত মনসুর হয়ে পরে আল্লাহ্-ভক্ত।

স্ত্রীর আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থচিন্তায় আহত হয় মধ্যম পুত্র আহসান। তৃতীয় পুত্র মকবুল মৃত্যুপথযাত্রীর মতো স্ত্রীর কাছে রাখে তার অন্তিম অনুরোধ। কন্যা আমেনা বিপন্নবোধ করে এবং অবাধ্যতা ছেড়ে আত্মসমর্পণের অঙ্গীকার নিয়ে স্বামীকে চিঠি লিখতে বসে।

পরিশেষে গৃহভৃত্য আবদুলের আসন্ন প্রসব-বেদনা আক্রান্ত স্ত্রীর মৃত্যুর আশংকা পরিবারের সকলকে আশ্বস্ত করে। সকলে ফিরে পায় স্বস্তি।

আবদুলের স্ত্রী এক সঙ্গে প্রসব করে যমজ বাচ্চা। মৃত্যু নয়, নতুন জন্মের মাধ্যমে নভেলেটটি পেয়েছে পরিসমাপ্তি। সমাপ্তি অংশে পৌত্রের পাঠানুশীলনে তা সংকেতিত হয়েছেঃ

> "বাচ্চা ছেলেটা বিছানায় শুয়ে তখনও ঘুমের ঘোরে পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করছে। আর বিড় বিড় করে বলছে, আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, হে ফেরেশতা শ্রেষ্ঠ ইবলিশ। আমি তামাম জাহানের শ্রেষ্ঠ জীব ইনসানকে পয়াদা করিয়াছি। ইহাকে সেজদা কর। ইবলিশ তবুও রাজী হইল না। তবু সেজদা করিল না।"১১৪

'কয়েকটি মৃত্যু'তে শারীরিক কোন মৃত্যু নেই, আছে কেবল প্রতীকী মৃত্যু। এ ক্ষেত্রে মৃত্যুর প্রতীকী ব্যঞ্জনা নির্মাণে জহির রায়হান সার্থক।

তথ্য-নির্দেশ

১ সৈয়দ আকরম হোসেন: রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: দেশকাল ও শিল্প-রূপ (বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯), পৃ ১৭

২ আফজালুল বাসার: জহির রায়হান: তাঁর সাহিত্য ও অপ্রকাশিত ডায়েরী (উত্তরাধিকার, আবু হেনা মোস্তফা কামাল সম্পাদিত, জানুয়ারী– মার্চ ১৯৮৭), পৃ ৪০
৩ সরোয়ার জাহান: জহির রায়হান: ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, পৃ,৯
৪ পূর্বোক্ত, পৃ ৯
৫ পূর্বোক্ত, পৃ ৯
৬ পূর্বোক্ত, পৃ ৯
৭ পূর্বোক্ত, পৃ ৯
৮ খালেদা এদিব চৌধুরী: শহীদুল্লা কায়সারের স্মরণে (শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে, মযহারুল ইসলাম সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩), পৃ ২৬৩
৯ শাহরিয়ার কবির: ভূমিকা (জহির রায়হান: একুশে ফেব্রুয়ারী, ঢাকা, ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৬), পৃ ৮
১০ খালেদা এদিব চৌধুরী: শহীদুল্লা কায়সারের স্মরণে, পূর্বোক্ত, পৃ ২৬৬
১১ শাহরিয়ার কবির: ভূমিকা, পূর্বোক্ত, পৃ ৮
১২ সরোয়ার জাহান: জহির রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ ১৩
১৩ পূর্বোক্ত, পৃ ১৩
১৪ আফজালুল বাসার: জহির রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ ৫
১৫ সরোয়ার জাহান: জহির রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ ১৫
১৬ পূর্বোক্ত, পৃ ১০–১১
১৭ মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক: জহির রায়হান (শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে, মযহারুল ইসলাম সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩), পৃ ২৬৯
১৮ পূর্বোক্ত, পৃ ২৬৯
১৯ সরোয়ার জাহান: জহির রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ ১১
২০ সরোয়ার জাহান: জহির রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ, ৬১
২১ মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক: জহির রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ ২৭০
২২ সুভাষ দত্ত: নেই তবুও (রূপসী, জহির রায়হান স্মৃতি সংখ্যা, ১৯৭২), পৃ ২
২৩ সৈয়দ আকরম হোসেন: রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: চেতনালোক ও শিল্পরূপ (ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১), পৃ ১৬
২৪ আফজালুল বাসার: জহির রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ ৬

২৫ সরোয়ার জাহান: জহির রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ ১৩
২৬ আফজালুল বাসার: জহির রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ ৬
২৭ সারোয়ার জাহান: জহির রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ ১৩
২৮ পূর্বোক্ত, পৃ ১৩
২৯ পূর্বোক্ত, পৃ ৬১
৩০ শাহরিয়ার কবির: ভূমিকা, পূর্বোক্ত, পৃ ৮
৩১ সরোয়ার জাহান: জহির রায়হান, পুর্বোক্ত, পৃ ১৩
৩২ পূর্বোক্ত, পৃ ১৩
৩৩ আফজালুল বাসার: জহির রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ ৫
৩৪ আকরম হোসেন: বাংলাদেশের উপন্যাস: চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পজিজ্ঞাসা–প্রসঙ্গ (সাহিত্য পত্রিকা, নীলিমা ইব্রাহিম সম্পাদিত, সপ্তদশ বর্ষ: দ্বিতীয় সংখ্যা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৮০), পৃ ১৯
৩৫ পূর্বোক্ত, পৃ ১৯
৩৬ শাহরিয়ার কবির: ভূমিকা, পূর্বোক্ত, পৃ ৯
৩৭ আকরম হোসেন: বাংলাদেশের উপন্যাস, পূর্বোক্ত, পৃ ২০
৩৮ এ. কে. এম. খায়রুল আলম: জহির রায়হানের গল্প (বাংলা একাডেমী পত্রিকা, আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, মাঘ–চৈত্র, ১৩৮৬), পৃ ৪৪
৩৯ কামরুদ্দীন আহমদ: পূর্ব বাঙলার সমাজ ও রাজনীতি (ঢাকা, স্টুডেন্ট পাবলিকেশন্স, ১৩৭৬), পৃ ১২৬
৪০ সাঈদ–উর রহমান: পূর্ব বাঙলার রাজনীতি– সংস্কৃতি ও কবিতা (ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩), পৃ ৫০
৪১ আকরম হোসেন: বাংলাদেশের উপন্যাস, পূর্বোক্ত, পৃ ২৪
৪২ সাঈদ–উর রহমান: পূর্ব বাঙলার রাজনীতি–সংস্কৃতি ও কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃ ৯৭
৪৩ আফজালুল বাসার: জহির রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ ৮
৪৪ আকরম হোসেন: বাংলাদেশের উপন্যাস, পূর্বোক্ত, পৃ ৩০
৪৫ সরোয়ার জাহান: জহির রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ ৩২
৪৬ আতোয়ার রহমান: পূর্ব পাকিস্তানের উপন্যাস (আমাদের সাহিত্য, সরদার ফজলুল করিম সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯), পৃ১৫৬

৪৭ জহির রায়হান: শেষ বিকেলের মেয়ে (জহির রায়হান রচনাবলী, ১ম খন্ড, ২য় সং আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮২), পৃ ৬৭
৪৮ পূর্বোক্ত, পৃ ৯৮
৪৯ পূর্বোক্ত, পৃ ১০৬
৫০ সরোয়ার জাহান: জহির রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৭
৫১ জহির রায়হান: শেষ বিকেলের মেয়ে, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৮
৫২ সরোয়ার জাহান: জহির রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৬
৫৩ জহির রায়হান: শেষ বিকেলের মেয়ে· পূর্বোক্ত, পৃ ৫৭
৫৪ পূর্বোক্ত, পৃ ৭৪
৫৫ পূর্বোক্ত, পৃ ৮১
৫৬ পূর্বোক্ত, পৃ ৯৯
৫৭ পূর্বোক্ত, পৃ ১০৬
৫৮ জহির রায়হান: তৃষ্ণা (জহির রায়হান রচনাবলী, ২য় খন্ড, ২য় সং, আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৮), পৃ ১০৬
৫৯ পূর্বোক্ত, পৃ ১০৬
৬০ পূর্বোক্ত, পৃ ১০৬
৬১ পূর্বোক্ত, পৃ ৯২
৬২ পূর্বোক্ত, পৃ ৩৮
৬৩ পূর্বোক্ত, পৃ ৪০
৬৪ সরোয়ার জাহান: জহির রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৮
৬৫ আকরম হোসেন: বাংলাদেশের উপন্যাস, পূর্বোক্ত, পৃ ৩০
৬৬ আফজালুল বাসার: জহির রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ ২৯
৬৭ সৈয়েদা আয়েশা কোরেশী: পুস্তক সমালোচনা (কেতন, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৬৫), পৃ ২৭
৬৮ পূর্বোক্ত, পৃ ২৭
৬৯ নুরুর রহমান খান: জহির রায়হান: উপন্যাস ও চরিত্রচিত্রণ (বাংলা একাডেমী পত্রিকা, আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, মাঘ–আষাঢ়, ১৩৮৫–৮৬), পৃ ১৩১
৭০ সৈয়দা আয়েশা কোরেশী: পুস্তক সমালোচনা, পূর্বোক্ত, পৃ ৩০

৭১ জহির রায়হান: হাজার বছর ধরে (জহির রায়হান রচনাবলী, ১ম খন্ড, ২য় সং, আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮২), পৃ ১৭৯
৭২ আফজালুল বাসার: জহির রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ ২৯
৭৩ জহির রায়হান: হাজার বছর ধরে, পূর্বোক্ত, পৃ ২০০
৭৪ পূর্বোক্ত, পৃ ১৯৩
৭৫ পূর্বোক্ত, পৃ ১৯৩
৭৬ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান: পূর্বপাকিস্তানী কথা সাহিত্য, (আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৫), পৃ ১৪৫
৭৭ আলমগীর কবির: জহির একটি চেতনা (দৈনিক বাংলা, ৯ম বর্ষ, ৮৩শ সংখ্যা, ১৯৭২), পৃ ৪
৭৮ সরোয়ার জাহান: জহির রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৫
৭৯ আকরম হোসেন: বাংলাদেশের উপন্যাস, পূর্বোক্ত, পৃ ৩০
৮০ আফজালুল বাসার: জহির রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ ১
৮১ জহির রায়হান: আরেক ফাল্গুন (জহির রায়হান রচনাবলী, ১ম খন্ড, ২য় সং, আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮২), পৃ ২০৬
৮২ পূর্বোক্ত, পৃ ২৯১
৮৩ পূর্বোক্ত, পৃ ৩০০
৮৪ পূর্বোক্ত, পৃ ২৯৯
৮৫ পূর্বোক্ত, পৃ ২৭২-৭৩
৮৬ পূর্বোক্ত, পৃ ২২৯
৮৭ পূর্বোক্ত, পৃ ২৯৯
৮৮ পূর্বোক্ত, পৃ ২৫১-৫২
৮৯ পূর্বোক্ত, পৃ ২৭২
৯০ পূর্বোক্ত, পৃ ২৫৬
৯১ পূর্বোক্ত, পৃ ২৩২
৯২ নুরুল রহমান খান: পূর্বোক্ত, পৃ ১১৭
৯৩ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান: পূর্বপাকিস্তানী কথাসাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃ ১৪৫
৯৪ আফজালুল বাসার: জহির রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ ৭

৯৫ জহির রায়হান: বরফ গলা নদী (জহির রায়হান রচনাবলী, ১ম খন্ড, ২য় সং, আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, ঢাকা, আহম্মদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮২), পৃ ৪২৩

৯৬ আকরম হোসেন: বাংলাদেশের উপন্যাস, পূর্বোক্ত, পৃ ৩০

৯৭ আফজালুল বাসার: জহির রায়হান পূর্বোক্ত, পৃ ৩

৯৮ জহির রায়হান: বরফ গলা নদী, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৭৫

৯৯ পূর্বোক্ত, পৃ ৩২৩–২৪

১০০ পূর্বোক্ত, পৃ ৩৫৪

১০১ পূর্বোক্ত, পৃ ৩৭৩–৭৪

১০২ পূর্বোক্ত, পৃ ৪২৩

১০৩ পূর্বোক্ত, পৃ ৪২৫

১০৪ আফজালুল বাসার: জহির রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ ৭

১০৫ জহির রায়হান: আর কতদিন (জহির রায়হান রচনাবলী, ২য় খন্ড, ২য় সং, আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, ঢাকা, আহম্মদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৩), পৃ ৫

১০৬ পূর্বোক্ত, পৃ ৩৪

১০৭ পূর্বোক্ত, পৃ ২৫

১০৮ পূর্বোক্ত, পৃ ২১–২২

১০৯ সুভাষ দত্ত: নেই তবুও, পূর্বোক্ত, পৃ ২
আরও দ্রষ্টব্য: আফজালুল বাসার: জহির রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ ৫

১১০ জহির রায়হান: কয়েকটি মৃত্যু, জহির রায়হান রচনাবলী (২য় খন্ড, ২য় সং, আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৩), পৃ ১২০

১১১ সরোয়ার জাহান: জহির রায়হান, পূর্বোক্ত, পৃ ৫৫

১১২ জহির রায়হান: কয়েকটি মৃত্যু, পূর্বোক্ত, পৃ ১৪০

১১৩ পূর্বোক্ত, পৃ ১৪০

১১৪ পূর্বোক্ত, পৃ ১৪৪